ভূমিকম্পের পটভূমি

ভূমিকম্পের পটভূমি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীবিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ ও ছবি : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৬০

ভূমিকম্পের পটভূমি

শহরসুদ্ধ লোক তাঁকে রণদা-মামা বলে ডাকত, কেবল আমরা ছেলে-ছোকরার দল আড়ালে তাঁকে বলতাম—রণ-দামামা। তাঁর আসল নাম ছিল রণদাপ্রসাদ কুণ্ডু। ছোটখাটো মানুষটি, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ; কিন্তু বাপরে, কী গলার আওয়াজ! ঠিক যেন দামামা বাজছে।

সে কি আজকের কথা! তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আমরা আমাদের ছোট্ট শহরে কেউ বা স্কুলের বেড়া পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি, কেউ বা ঢুকব ঢুকব করছি। বিকেলবেলা ফুটবল খেলে সন্ধ্যের পর মাঠের মাঝখানেই গোল হয়ে বসে গল্প করতাম। আমাদের এই মেঠো আড্ডায় মাঝে মাঝে রণদামামা দর্শন দিতেন। দূর থেকে তাঁর হুংকার শুনতে পেতাম—'ওহে, তোমরা এখনো মাঠে বসে আছ!'

শহরে রণদামামার একটি ছোট্ট আবকারির দোকান ছিল; আফিম, গাঁজা, ভাঙ এই সব বিক্রি করতেন। সন্ধ্যের সময় দোকান বন্ধ করে বাড়ি যেতেন। আমাদের সন্দেহ ছিল বাড়ি যাবার আগে রণদামামা এক কলকে গাঁজায় দম দিতেন। যেদিন মাত্রা বেশী হয়ে যেত সেদিন বাড়ি না গিয়ে আমাদের আড্ডায় এসে বসতেন। তখন তাঁর মুখ দিয়ে গল্পের ফোয়ারা ছুটত। এমন সব আষাঢ়ে আজগবী গল্প ঝাড়তেন যে, আমরা চমৎকৃত হয়ে শুনতাম।

তাঁর সব গল্পই প্রায় ভুলে গেছি, এতদিন পরে মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু একটা গল্প ভুলিনি। গল্পটার কতখানি গাঁজা এবং কতখানি সত্যি তা জানি না, কিন্তু বোধহয় আগাপাস্তলা গাঁজা নয়।

যাহোক, গল্পটা যখন মনে আছে তখত লিখে রাখছি। রণদামামা বহুকাল গত হয়েছেন, মনে করা যাক এই গল্পটা তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ।

দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সন্ধ্যের ছায়া ঘনিয়ে আসছে; আমরা অর্ধচন্দ্রের আকারে ফুটবল খেলার মাঠের মাঝখানে বসেছি, আমাদের সামনে পদ্মাসনে বসেছেন রণদামামা। আজ তিনি কি রকম গল্প ঝাড়বেন কিছুই জানি না, কিন্তু উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি—

আকাশে ঘড়র্ ঘড়র্ শব্দ শোনা গেল। আমরা ঘাড় তুলে দেখলাম একটা এরোপ্লেন আসছে। সেকালে ভারতবর্ষে এরোপ্লেন এমন ন'কড়া ছ'কড়া ছিল না, কালেভদ্রে এক-আধটা দেখা যেত। আমরা খুব আগ্রহের সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে চেয়ে রইলাম। প্লেনটা প্রায় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

তার ঘড়র্ ঘড়র্ শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবার পর আমাদের দলের প্রাণধন দুষ্টুমি করে প্রশ্ন করল—'মামা, আপনি কখনো এরোপ্লেনে চড়ে আকাশে উড়েছেন?'

রণদামামা বললেন—'এরোপ্লেনে কখনো চড়িনি কিন্তু আকাশে উড়েছি।'

পানু বলল—'অ্যাঁ! বেলুনে চড়েছেন নাকি?'

রণদামামা বললেন—'না, বেলুন নয়। আজ তবে সেই গল্পটাই বলি।'

তিনি গল্প বলতে আরম্ভ করলেন। সন্ধ্যে পেরিয়ে ক্রমে রাত্রি হল, কিন্তু আমাদের সেদিকে লক্ষ্য নেই। অন্ধকারে বসে রণদামামার গমগম গলার আওয়াজ শুনতে লাগলাম—

তখন আমার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। বউ মারা যাবার পর

দেশে আর মন টিকল না। দেশে তখন ফিজি দ্বীপে যাবার হিড়িক লেগেছে; সেখানে গেলেই নাকি ভাল চাকরি পাওয়া যায়। ঠিক করলাম ফিজি দ্বীপেই যাব। আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, কেবল এক দূর-সম্পর্কের জ্যাঠাইমা আছেন; দেশ ছাড়ার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি এক বোতল গঙ্গাজল আমার হাতে দিয়ে বললেন—'বিদেশ-বিভূঁয়ে যাচ্ছিস, এই গঙ্গাজল সঙ্গে রাখ, মাঝে মাঝে দু'ফোঁটা মুখে দিস।'

জ্যাঠাইমাকে পেন্নাম করে গঙ্গাজলের বোতল নিয়ে কলকাতায় গেলাম। তারপর একদিন ফিজিযাত্রী জাহাজে চড়ে বসলাম।

কাঠের জাহাজ; সেকালে লোহার জাহাজ তৈরী হতো না। জাহাজটির বেশ বয়স হয়েছে; দুলে দুলে এঞ্জিনের ধমকে কাঁপতে কাঁপতে চলল। আমি আগে কখনো জাহাজে চড়িনি, ভাবলাম সব জাহাজই বুঝি এই রকম হয়। তখন কি জানি যে, ইংরেজ বাহাদুর কুলি চালান দেবার জন্যে এইসব ঘুণধরা হাড়-জিরজিরে জাহাজ রেখেছে। যদি ডোবে তো কতকগুলো দিশি কুলি ডুবে মরবে বই তো নয়।

যাহোক, জাহাজ তো ম্যালেরিয়া রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে গঙ্গা পেরিয়ে সাগরে পড়ল, সেখান থেকে পুবদিকে একটু বাঁক নিয়ে দক্ষিণ মুখে চলল। কত দিনে ফিজি পৌছব তার ঠিক নেই; রাস্তা তো আর একটুখানি নয়, চার হাজার মাইল।

কিন্তু জাহাজের জীবনযাত্রার কথা যদি আরম্ভ করি তাহলে গল্প শেষ করতে রাত কাবার হয়ে যাবে। জাহাজের কথা সাটে বলছি।

জাহাজে একরকম ভালই আছি। জাহাজের দোলানিতে আমার গা বমি-বমি করে না; খাই-দাই, ডেকে ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে বোতল থেকে দু'ফোঁটা গঙ্গাজল হাতের তেলোয় নিয়ে মুখে

বিদেশ-বিভূঁয়ে যাচ্ছিস, এই গঙ্গাজল সঙ্গে রাখ, মাঝে মাঝে দুফোঁটা মুখে দিস্।

দিই। সময়ের কোনো হিসেব নেই, দিনের পর দিন কাটছে। জাহাজ মাঝে মাঝে বন্দরে থামছে আবার চলছে। বঙ্গোপসাগরের পর মলক্কা প্রণালী, তারপর ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ। জাহাজ তার মধ্য দিয়ে চলেছে। অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ দিকে পড়ে রইল, আমরা পুব দিকে এগিয়ে চললাম।

প্রশান্ত মহাসাগর। বেশ শান্তশিষ্ট সমুদ্র; বেশী ঢেউ নেই। আমাদের দীর্ঘ যাত্রা শেষ হয়ে আসছে, আর দু'হপ্তার মধ্যে ফিজি পৌঁছে যাব। জাহাজের একঘেয়ে জীবন এবার শেষ হবে ভেবে বেশ আনন্দ হচ্ছে।

তারপর ফিজি দ্বীপপুঞ্জের এলাকায় পৌঁছুতে যখন আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি আছে তখন হঠাৎ উত্তর দিক থেকে এল ঝড়। যাকে বলে সাইক্লোন।

সমুদ্র জাহাজ এক মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজটা দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল; কখনো দুটো প্রকাণ্ড ঢেউ-এর মাঝখানে তলিয়ে যাচ্ছে, কখনো ঢেউ-এর মাথায় চড়ে বসছে। সে যে কী ভয়ানক দৃশ্য, বর্ণনা করা যায় না।

জাহাজের খোলের মধ্যে দৃশ্য আরো মর্মভেদী। যাত্রীরা কেউ বুক চাপড়াচ্ছে, কেউ চিৎকার করে কাঁদছে। একজন খালাসী বলল—'বুড়ো জাহাজ সাইক্লোনে পড়েছে, টিকবে কিনা সন্দেহ। আল্লার নাম কর।'

আমি দেখলাম আজ আর রক্ষে নেই, যদি বাঁচি পুনর্জন্ম হবে। আমার সঙ্গে যা টাকাকড়ি ছিল ধুতির খুঁটে বেঁধে কোমরে জড়িয়ে নিলাম, আর গঙ্গাজলের বোতলটা দড়ি বেঁধে গলায় ঝোলালাম। যদি মরেই যাই গঙ্গালাভ হবে।

জাহাজ কিন্তু ঝড়ে ডুবল না। তার এঞ্জিন ভেঙে পড়ল, কম্পাস খারাপ হয়ে গেল, তবু সে ভেসে রইল; ঝড়ের মুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে

অসহায়ভাবে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলল। তিন দিন তিন রাত এইভাবে চলল। তারপর ঝড় ঠাণ্ডা হল।

ঝড় ঠাণ্ডা হল বটে, কিন্তু সমুদ্র দুলতেই লাগল; জাহাজটা তার ওপর মোচার খোলার মত ভেসে চলেছে। এঞ্জিন ভাঙা, কম্পাসও খারাপ হয়ে গেছে, কাজেই জাহাজকে ইচ্ছেমত চালানো যাচ্ছে না। আকাশে সূর্য উঠেছে, মেঘ কেটে গেছে; কিন্তু জাহাজের অবস্থা সঙ্গীন, কখন কি হয় বলা যায় না। আমি দুর্গানাম জপ করছি আর মাঝে মাঝে দু'চার ফোঁটা গঙ্গাজল খাচ্ছি।

তারপর চতুর্থ দিন সূর্যাস্তের সময় সর্বনাশ হল। সমুদ্রের তলায় একটা পাহাড়ের ডগা উঁচু হয়ে ছিল, জাহাজটা ভাসতে ভাসতে তাইতে মারল ধাক্কা। ব্যস্, চক্ষের নিমেষে জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাসের বাড়ির মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি ছিটকে জলে পড়লাম।

কিছুক্ষণের জন্যে বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম জাহাজের চিহ্নমাত্র নেই। উথল-পাথার সমুদ্রের মাঝখানে আমি একা নাগর-দোলায় ওঠানামা করছি। অবস্থাটা ভেবে দেখ। জাহাজে প্রায় দু'শো মানুষ ছিল, কেউ কোথাও নেই।

দিনের আলো নিবে এল। আর বেশীক্ষণ ভেসে থাকতে পারব কিনা সন্দেহ। হঠাৎ দেখলাম পাশ দিয়ে একটা তক্তা ভেসে যাচ্ছে; তক্তপোশের মতন একখণ্ড তক্তা, বোধহয় জাহাজেরই ভাঙা একটা অংশ। আমি হাঁচোড়-পাঁচোড় করে তার ওপর উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত হল, আকাশে তারা ফুটে উঠল। আমি চিত হয়ে শুয়ে দোল খাচ্ছি। দোল খেতে খেতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। একেবারে ঘুম ভাঙল যখন রোদ উঠেছে।

সেই আকাশ সেই সমুদ্র; বোধহয় ঢেউগুলো একটু ছোট হয়েছে। চারদিকে দিগন্তরেখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। কিন্তু খাব কি? খাবার জিনিসের মধ্যে কেবল গঙ্গাজল। এত ব্যাপারের মধ্যেও গঙ্গাজলের বোতলটা ভাঙেনি।

সূর্য যখন মাথার ওপর উঠল তখন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বোতলের ছিপি খুলে এক ঢোক গঙ্গাজল খেলাম। বেশী খাবার সাহস নেই, ফুরিয়ে গেলে আর পাব না।

এইভাবে চলল। অকূল সমুদ্রে ভেসে চলেছি তক্তপোশের মত এক টুকরো কাঠের ওপর। খাবার নেই, গঙ্গাজলের বোতল শেষ হয়ে আসছে। মৃত্যুর আর দেরী নেই।

তৃতীয় দিন সকালবেলা গঙ্গাজল ফুরিয়ে গেল। ভাগ্যিস জ্যাঠাইমা গঙ্গাজল দিয়েছিলেন নইলে আমার জীবন অনেক আগেই ফুরিয়ে যেত। সমুদ্রের লোনা জল খেলে পাগল হয়ে মরতে হয়।

তৃতীয় দিন দুপুর বেলায় ক্ষিদেয় তেষ্টায় অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর সেই অবস্থায় ক'দিন কেটেছে জানি না। অচৈতন্য অবস্থায় স্বপ্ন দেখলাম ডাবের জল খাচ্ছি। তারপর চোখ মেলে দেখি সত্যিই ডাবের জল খাচ্ছি। একটা মেয়ে নারকেল-মালায় করে আমার মুখে ডাবের জল ঢেলে দিচ্ছে।

মেয়েটার গা কোমর পর্যন্ত মাথার চুল দিয়ে ঢাকা, শুধু মুখটি দেখা যাচ্ছে; কোমর থেকে নীচে লম্বা ঘাসের ঘাগরা। আমি চোখ খুলেছি দেখে সে কিচিরমিচির করে কী বলল কিছুই বুঝতে পারলাম না। সে আমাকে ডাবের জল খাইয়ে চলল।

মেয়েটা আমার পানে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে আর থেকে থেকে কিচিরমিচির করে কথা বলছে। তার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু ডাঙায় এসে ঠেকেছি তাতে সন্দেহ

নেই। অজ্ঞান অবস্থায় ভাসতে ভাসতে কোন্ অজানা দেশে হাজির হয়েছি কে জানে।

আধ ঘণ্টা পরে গায়ে একটু বল পেয়েছি এমন সময় আমার নীচে ভিজে বালি টলমল করে নড়ে উঠল; ঠিক যেন ভূমিকম্প হল। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেয়েটার মুখের পানে তাকালাম। মেয়েটা হাত উলটে কী বলল বুঝতে পারলাম না।

মাটির কাঁপুনি থামলে আমি চারিদিকে তাকালাম। সামনে অপার সমুদ্র, আমি সমুদ্রের কিনারায় বালির ওপর বসে আছি, আমার পিছনে নারকেল গাছের জঙ্গল। শুধু পিছনে নয়, সামনেও সমুদ্রের জলের ভেতর থেকে এখানে ওখানে নারকেল গাছের মাথা জেগে আছে। আমি জানতাম যে, সমুদ্রের ধারে নারকেল গাছ জন্মায়, কিন্তু জলের মধ্যেও জন্মায় কখনো শুনিনি।

আমি উঠে বসেছি দেখে মেয়েটা আমার হাত ধরে তুলে দাঁড় করালো; তার ভাব দেখে বুঝলাম সে আমাকে সমুদ্রতীর থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আমি তার হাত ধরে দু'পা এগিয়েছি এমন সময় যা দেখলাম তাতে আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া হয়ে গেল।

নারকেল গাছের জঙ্গল থেকে একটা জন্তু লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে; অনেকটা উট পাখির মত দেখতে, কিন্তু উট পাখির চেয়ে দশগুণ বড়; দু'পাশে অর্ধেক পাখনা মেলে ছুটে আসছে। মনে কর একটা ছোটখাটো এরোপ্লেন।

আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, আমি আবার থপ করে বসে পড়লাম। জন্তুটা যখন কাছাকাছি এসেছে তখন মেয়েটা একহাত তুলে চিৎকার করে উঠল—'খিট্টা!'

অমনি জন্তুটা দাঁড়িয়ে পড়ল। লম্বা গলা বাড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল। মেয়েটা তাকে আরো কী সব বলল। তখন

সে আস্তে আস্তে পা ফেলে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

আমি কম্পিত কলেবরে বসে ঘাড় উঁচু করে তাকে দেখতে লাগলাম। জন্তু বললাম বটে, কিন্তু চারপেয়ে জন্তু নয়, প্রকাণ্ড একটা পাখি। ঠোঁটের গড়ন হাঁসের মতন, পায়ের আঙুলগুলোও হাঁসের মতন চামড়া দিয়ে জোড়া। কিন্তু গায়ে পাখির মতন পালক নেই। বাদামী রঙের লোম।

পাখিটা গলা বাড়িয়ে গোল গোল চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে, মেয়েটা তাকে কি যেন হুকুম করল। অমনি পাখিটা উড়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে বসল, জলের ওপর সাঁতার কেটে গলা ডুবিয়ে ডুবিয়ে বোধহয় মাছ ধরতে লাগল।

আমার হৃৎকম্প থামলে আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম, মেয়েটা হাত ধরে আমাকে ভিতর দিকে নিয়ে চলল। আমি পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম পাখিটা পানকৌড়ির মতন সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে আর ভেসে উঠছে।

আমরা নারকেল বন পেরিয়ে এসে দেখলাম পাথুরে মাটি ক্রমে উঁচু দিকে উঠেছে। সবার ওপর শিরদাঁড়ার মতন একটানা পাহাড়। পাহাড় কিন্তু বেশী উঁচু নয়, বড়জোর সমুদ্র থেকে দু'শো ফুট; তার ঢালু গা বেয়ে উঠতে কষ্ট হয় না।

পাহাড়ের পিঠের ওপর উঠে ওদিকের দৃশ্য দেখতে পেলাম। এদিকেও সমুদ্র, কিন্তু সমুদ্রের কিনারায় গাছ নেই, কেবল তীরের জল থেকে অসংখ্য নারকেল গাছ মাথা জাগিয়ে আছে। এদিকেও জমি বেশ ঢালু, কিন্তু বালি নেই। মাঝে মাঝে লম্বা ঘাসের গোছা উঁচু হয়ে আছে। এই ঘাস দিয়ে ঘাগরা তৈরি করে মেয়েটা পরেছে।

পাহাড়ের পিঠের ওপর উঠে বুঝতে পারলাম এটা একটা দ্বীপ। সামনে পিছনে যেমন সমুদ্র, ডাইনে বাঁয়ে দূরের দিকে তাকালে

তেমনি সমুদ্র চোখে পড়ে। দ্বীপটা লম্বাটে ধরনের, বোধহয় দু'মাইল লম্বা হবে, আর চওড়া আধ মাইল। কিন্তু আশ্চর্য, এখানে এই মেয়েটা ছাড়া অন্য মানুষ দেখতে পেলাম না।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে সারি সারি ফুটো। ফুটোগুলো প্রকৃতির তৈরী ফুটো নয়, প্রকৃতি অমন সার গেঁথে ফুটো তৈরি করে না; মনে হল, মানুষ পাহাড়ের গা খুঁড়ে ঘর তৈরি করেছে, এই ফুটোগুলো তার দোর।

কিন্তু এতগুলো ঘর যদি থাকে তাহলে মানুষও নিশ্চয় অনেকগুলো আছে। আমি ফুটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম—'ওগুলো কী?

মেয়েটা বলল—'কিচমিচ কিচমিচ।'

এর পর আর কথা বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমি ওর ভাষা বুঝি না, ও আমার ভাষা বোঝে না। মেয়েটা যেন ভারী মজা পেল, মুক্তোর মত দাঁত বের করে হেসে আমার হাত ধরে ওই ফুটোগুলোর দিকে নিয়ে চলল।

কাছে গিয়ে দেখলাম আমি যা আন্দাজ করেছিলাম মিথ্যে নয়। ফুটোর ভেতরে ছোট ছোট কুঠরি; পাহাড়ের গা কেটে ঘর তৈরি করেছে। ফুটোগুলো হচ্ছে দরজা, ঘরগুলো লম্বায় আন্দাজ আট হাত, চওড়ায় পাঁচ হাত। দেয়াল এবড়োখেবড়ো, জানালা নেই, কেবল ওই দোরের ফুটোটি আছে।

মেয়েটা আমাকে একটি কুঠরির মধ্য নিয়ে গেল। মেঝের ওপর নারকেল বালদো আর লম্বা ঘাসের বিছানা পাতা; দেয়াল ঘেঁষে একসারি নারকেল-মালার পাত্রে কি সব রয়েছে; অন্য দেয়ালের গায়ে খানিকটা ছাই আর কিছু জ্বালানি কাঠ। মনে হল মেয়েটা এই কুঠরিতেই থাকে, অন্য কুঠরিগুলোতে কেউ থাকে কিনা কে জানে।

আমাকে বিছানায় বসিয়ে মেয়েটা আমার সামনে বসল, আমার

মুখের পানে চেয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল। কথা বলার উপায় নেই। মেয়েটার চুলে-ঘেরা মুখখানা বেশ সপ্রতিভ। বয়স ঠিক বোঝা যায় না; আমাদের দেশের মেয়ে হলে বলতাম বয়স চোদ্দ কি পনেরো। আমি তার পানে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলাম, এরা আদিম জাতের মানুষ, এখনো সভ্যতার স্বাদ পায়নি; কাপড় পরতে জানে না, ঘাসের ঘাগরা পরে বেড়ায়। কী খায় কে জানে, হয়তো এই দ্বীপে নারকেল ছাড়া আর কোনো খাবার জিনিস নেই—

এই সময় বিরাট পাখিটা উড়ে এসে দোরের ফুটোর সামনে বসল। ঘরের ভেতর গলা বাড়িয়ে বলল—'প্যাঁক!'

তারপর আশ্চর্য ব্যাপার। মেয়েটা ছুটে গেল দোরের কাছে। আমিও পিছু পিছু গেলাম। দেখি, মেয়েটা পাখির পেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাছ বের করছে। আগে লক্ষ্য করিনি, পাখিটার পেটের ওপর একটা পকেট আছে। সামান্য পকেট নয়, চটের ছালার মত প্রকাণ্ড পকেট। বুঝলাম পাখিটা সমুদ্রে মাছ ধরে তখনি-তখনি খায় না, পকেটে পুরে মেয়েটার কাছে নিয়ে আসে।

মেয়েটা পাখির পকেট থেকে গোটা পাঁচেক মাঝারি গোছের মাছ বের করে নিয়ে তাকে কি বলল। পাখিটা প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে একটু দূরে সরে গেল, পকেট থেকে ঠোঁট দিয়ে মাছ বের করে টপাটপ গিলতে লাগল। তার পকেটে আরো অনেক মাছ ছিল।

মেয়েটা বাকী মাছগুলো নিয়ে কুঠরির মধ্যে এল, আমার পানে চেয়ে খিলখিল করে হাসল। বুঝলাম, মেয়েটা শুধু নারকেল খায় না, মাছও খায়।

সেদিন পেট ভরে আগুনে ঝলসানো মাছ খেয়েছিলাম। আর জানতে পেরেছিলাম এই দ্বীপে এই মেয়েটা ছাড়া অন্য মানুষ নেই।

এর পর দু'মাসের কথা বাদ দিচ্ছি। এই দু'মাসে আমি আর

মেয়েটা পরস্পরের ভাষা শিখে নিলাম; অর্থাৎ ওর ভাষা আমি বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না, আর ও আমার ভাষা বলতে পারে না কিন্তু বুঝতে পারে।

মেয়েটার নাম তিতি। পাখির নাম খিট্টা।

ভাষা শেখার পর দ্বীপের ইতিহাস আস্তে আস্তে জানা গেল।

খিট্টার জাতের পাখিরাই এই দ্বীপের আদিম অধিবাসী। অন্য কোনো পাখি নয়, কেবল খিট্টার জাতের অতিকায় পাখি। তারপর কে জানে কত হাজার বছর আগে কোথা থেকে একদল মানুষ ভেলায় ভাসতে ভাসতে এখানে উপস্থিত হল। পাখিগুলো দেখতে প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু খুব নিরীহ, সহজে পোষ মানে। মানুষেরা তাদের পোষ মানাল; নারকেল আর মাছ খেয়ে দ্বীপে বাস করতে লাগল; পাহাড়ের গায়ে ফুটো করে ঘর তৈরি করল। আমার বিশ্বাস মানুষগুলো প্রথম যখন এসেছিল তখন তাদের সঙ্গে লোহা কিংবা তামার যন্ত্রপাতি অস্ত্রশস্ত্র ছিল; সেসব বহুকাল আগে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে। এখন আর দ্বীপে ধাতু নেই।

দ্বীপটা আগে আরো অনেক বড় ছিল, তার আশেপাশে দু'চার মাইলের মধ্যে আরো অনেক ছোট ছোট দ্বীপ ছিল। যখন মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন অনেক গোষ্ঠী অন্য দ্বীপে গিয়ে বসবাস করতে লাগল।

খিট্টা জাতের পাখি সম্বন্ধে আসল কথাটাই এখনো বলিনি। পাখিগুলো আগে নিজেরাই সমুদ্রে মাছ ধরে খেতো। মানুষেরা তাদের শেখালো মাছ ধরে পকেটে করে নিয়ে আসতে; সেই মাছ পকেট থেকে বের করে মানুষেরা খেতো। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি অল্পে সন্তুষ্ট থাকে না। গল্প শুনেছে নিশ্চয়, ভগবান বিষ্ণু গরুড়ের পিঠে চেপে আকাশে উড়ে বেড়ান। এই দ্বীপের মানুষগুলোও তেমনি পাখিদের শিখিয়ে পড়িয়ে তাদের পকেটের মধ্যে ঢুকে উড়ে

বেড়াতে লাগল।

প্রথম যেদিন কথাটা শুনলাম, সেদিন দুপুরবেলা তিতি আর আমি সমুদ্রের ধারে বসে গল্প করছিলাম; খিট্টা কিছু দূরে বালির ওপর পা গুটিয়ে বসে ঝিমুচ্ছিল। খিট্টার চোখে দু'টো পর্দা, একটা স্বচ্ছ অন্যটা অস্বচ্ছ। সে যখন সমুদ্রে মাথা ডুবিয়ে মাছ ধরে তখন স্বচ্ছ পর্দাটা বন্ধ রাখে, আর যখন ঘুমোয় তখন দু'টো পর্দাই তার গোল গোল চোখের ওপর নেমে আসে।

তিতি মেয়েটা অসভ্য আদিম জাতের মেয়ে বটে, কিন্তু তার বেশ বুদ্ধি আছে; খুব চটপটে হাসিখুশি স্বভাব। ভাষা শেখার পর থেকে সে অনর্গল কথা বলে। আমাকে পেয়ে সে যেন বেঁচে গেছে, একটা কথা কইবার লোক পেয়েছে।

সেদিন গল্প করতে করতে টের পেলাম মাটি দুলে উঠল। এখন আমার ভূমিকম্প অভ্যেস হয়ে গেছে, প্রায়ই মাটি দোলে। রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়, অনুভব করি দ্বীপ টলমল করে দুলছে; তারপর দোলা থামলে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ভবিষ্যতে যা হবার হবে, এখন ভেবে লাভ নেই।

তিতি হঠাৎ প্রশ্ন করল—'আচ্ছা, তোমাদের দেশে খিট্টা আছে?'

আমি বললাম—'খিট্টার মত এত বড় পাখি নেই, ছোট ছোট পাখি আছে।'

সে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'তাহলে তোমরা উড়তে পার না?'

অবাক হয়ে বললাম—'উড়তে পারি না, তার মানে? তুমি উড়তে পার নাকি?'

তিতি ঘাড় নেড়ে বলল—'হ্যাঁ, উড়তে পারি। খিট্টার পকেটে ঢুকে কত উড়ে বেড়িয়েছি। তুমি আসার পর আর উড়িনি, তাই তুমি জান না। খিট্টা বুড়ো হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে বেশি দূর

উড়তে পারে না।'

'অ্যাঁ! তুমি আকাশে উড়তে পার! এ যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। তুমি খিট্টার পকেটে ঢুকতে পার?'

'কেন পারব না। একজন মানুষ বেশ ঢুকতে পারে। দেখবে? —খিট্টা! খিট্টা!'

খিট্টার চোখ তখনি খুলে গেল, সে উঠে দাঁড়াল। তিতি তার কাছে গিয়ে সাংকেতিক ভাষায় বলল—'বসে থাক্, বসে থাক্, আমি তোর পেটে ঢুকে উড়ব।'

খিট্টা আবার হাঁটু মুড়লো। তিতি তখন তার পেটের মধ্যে ঢুকে উবু হয়ে বসল। তার মুখখানি কেবল পকেটের ওপর বেরিয়ে রইল। পকেটে বাচ্চা নিয়ে ক্যাঙারুর ছবি দেখেছ নিশ্চয়, ঠিক সেই রকম।

তারপর খিট্টা পাখা মেলে দিয়ে দু'চার বার পাখা নাড়ল, দু'চার পা সামনে হেঁটে গিয়ে উড়তে আরম্ভ করল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য।

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। খিট্টা চিলের মতন পাক খেয়ে খেয়ে উঁচুতে উঠতে লাগল। অনেক উঁচুতে উঠে আবার পাক খেয়ে খেয়ে নামতে আরম্ভ করল। তারপর পাখা গুটিয়ে আমার সামনে এসে বসল।

তিতি খিট্টার পকেট থেকে বেরিয়ে এসে খিলখিল করে হাসল। বলল—'দেখলে উড়তে পারি কিনা! তুমি উড়বে?'

বললাম—'ও বাবা, খিট্টা যদি উঁচুতে তুলে নীচে ফেলে দেয়!'

তিতি বলল—'আচ্ছা তবে থাক। খিট্টার সঙ্গে তোমার আরো ভাব হোক, তারপর উড়ো।'

যাহোক, আকাশে ওড়ার কথাটা তোমাদের আগেই শুনিয়ে

ছিলাম। এবার দ্বীপের ইতিহাসে ফিরে যাই।

দ্বীপপুঞ্জের মানুষগুলো বেশ মনের সুখে ছিল। যখন ইচ্ছে পাখিতে চড়ে উড়ে বেড়াত, এ-দ্বীপ থেকে ও-দ্বীপে যেত, নেচে গেয়ে সময় কাটাত। অবশ্য তাদের খাবার জিনিসের মধ্যে কেবল নারকেল আর মাছ; কিন্তু আজন্ম তাতেই তারা অভ্যস্ত, তাই কষ্ট হতো না! তাদের খাবার সংগ্রহের জন্যে তিলমাত্র কষ্ট স্বীকার করতে হতো না; পাখিরা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে দেয়; নারকেল গাছে অজস্র নারকেল ফলে, পাড়ো আর খাও। চাষ করতে হয় না, জাল ফেলে মাছ ধরতে হয় না। বেপরোয়া সুখের জীবন।

এইভাবে অকূল সমুদ্রের মাঝখানে কয়েকটি দ্বীপের ওপর একদল মানুষ মনের আনন্দে বাস করছিল, হঠাৎ বছর তিনেক আগে এক সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটল। দুপুর রাত্রে দ্বীপ দুলতে আরম্ভ করল। মানুষগুলো ভয় পেয়ে যে যার কোটর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দ্বীপ যেন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিয়েছে, চারিদিক থেকে মড়মড় ঘড়ঘড় আওয়াজ আসছে। অন্ধকারে প্রলয়ংকর কাণ্ড।

এরা আগে কখনো ভূমিকম্প দেখেনি, কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারল না। আধ ঘণ্টা পরে আস্তে আস্তে ভূমিকম্পের বেগ কমল, কেবল মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছে। তারপর যখন সকাল হল, দেখা গেল দ্বীপ কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে, সমুদ্রের কিনারে যত নাবাল জমি ছিল সব ডুবে গেছে, কেবল নারকেল গাছগুলোর মাথা জেগে আছে। শুধু তাই নয়, আশেপাশে যে সব দ্বীপ ছিল সেগুলো বেবাক সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে গেছে, সেখানকার মানুষগুলো ডুবে মরেছে। কেবল বিরাট পাখিগুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।

তারপর থেকে দ্বীপ মাঝে মাঝে দুলে ওঠে। কিছুদিন পরে সকলে লক্ষ্য করল, যখনই দ্বীপ নড়েচড়ে ওঠে তখনি তার খানিকটা

জলের নীচে তলিয়ে যায়। দ্বীপটা যেন ফুটো জাহাজের মতন টলমল করতে করতে সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। এই ভাবে আরো কিছুদিন গেল; দ্বীপের মানুষগুলো বুঝল এ দ্বীপ আর বেশী দিন নয়, অন্য দ্বীপগুলোর মত এও একদিন সমুদ্রে তলিয়ে যাবে। তখন কী হবে? সকলকেই ডুবে মরতে হবে।

দ্বীপের মানুষগুলোর মধ্যে যারা প্রবীণ মাতব্বর লোক ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে উপায় স্থির করল। কয়েকজন লোক পাখিতে চড়ে চারিদিকে বেরিয়ে পড়ল, দেখতে গেল বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে এমন কোনো দ্বীপ আছে কিনা যা ভূমিকম্পে মজে যাচ্ছে না।

একে একে সবাই ফিরে এল। কেউ দ্বীপ দেখতে পায়নি, কেবল যে-লোকটা দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল সে বলল, উড়তে উড়তে অনেক উঁচুতে উঠে সে দূরে দিগন্তরেখার কাছে সবুজ রঙের একটা আভা দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তার পাখি এদিক ওদিক উড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তাই সে আর অত দূর যেতে সাহস করেনি, ফিরে এসেছে।

তখন তিন জন লোক নতুন পাখিতে চড়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলল। পাঁচ দিন তাদের দেখা নেই; তারপর তারা ফিরে এসে খবর দিল, পঁচিশ মাইল দক্ষিণে মস্ত বড় দ্বীপ আছে, দ্বীপে নারকেল গাছ আছে। তারা তিন দিন সেখানে থেকে দেখেছে, ভূমিকম্প নেই, দ্বীপ ডুবে যাচ্ছে না।

তখন এই দ্বীপ থেকে ওই দ্বীপের দিকে যাত্রা শুরু হল। সকলে নিজের নিজের পাখিতে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে দু'চার দিনের মধ্যে এই দ্বীপ খালি হয়ে গেল। রয়ে গেল কেবল তিতি।

তিতি দুনিয়ায় একা, মা-বাপ মরে গেছে; আছে শুধু ওই বুড়ো পাখি খিট্টা। সেও বেরিয়েছিল খিট্টায় চড়ে অন্য দ্বীপে যাবে বলে; কিন্তু খিট্টা চার-পাঁচ মাইল গিয়ে ফিরে এল। সে বোধহয়

বুঝতে পেরেছিল অন্য দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, তার আগেই সমুদ্রে পড়ে গিয়ে তিতিকে সঙ্গে নিয়ে ডুবে যাবে। তিতি আরো কয়েকবার চেষ্টা করল তাকে অন্য দ্বীপে নিয়ে যেতে, কিন্তু বুড়ো খিট্টা দু'চার মাইলের বেশী যায় না, ফিরে আসে। তিতিকে বয়ে নিয়ে পঁচিশ ত্রিশ মাইল উড়ে যাবার সাধ্য তার নেই।

তিতি একা দ্বীপে পড়ে রইল, তার একমাত্র সঙ্গী খিট্টা। তারপর দিনের পর দিন কাটছে। খিট্টা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনে, নারকেল গাছ থেকে নারকেল পাড়ে। তিতি জানে এ দ্বীপ থেকে তার বেরুবার উপায় নেই। দ্বীপ একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে; একদিন আসবে যেদিন দ্বীপ আর থাকবে না, তখন তিতিকে ডুবে মরতে হবে।

এই ভাবে প্রায় দু'বছর কাটার পর একদিন জোয়ারের মুখে ভাসতে ভাসতে আমার তক্তপোশ এসে দ্বীপের চড়ায় ঠেকল। তিতি আমার অজ্ঞান দেহটা টেনে ডাঙায় তুলল। তক্তপোশটা ভাঁটার টানে ভেসে গেল। তারপর থেকে যা-যা ঘটেছে মোটামুটি তোমাদের বলেছি।

পরস্পরের ভাষা আয়ত্ত করার পর আমাদের জীবন অনেকটা সহজ হয়ে এল; রোজ মাছ-পোড়া আর ডাব-নারকেল খাওয়াও সহ্য হয়ে গেল। কেবল একটা দুঃখ কিছুতেই ঘুচল না; এ দ্বীপে মিঠে জল নেই, জলের বদলে ডাবের জল খেতে হয়। তাতে হয়তো শরীর ঠাণ্ডা থাকে, কিন্তু মন মানে না; মন চায় জলের স্বাদ। জলের খোঁজে দ্বীপময় ঘুরে বেড়াই, যদি কোথাও দেখতে পাই পাথরের ফাটল দিয়ে ঝির ঝির করে জলের ধারা ঝরে পড়ছে। কিন্তু কোথায় জল! জল থাকলে আদিম মানুষগুলো অনেক আগেই আবিষ্কার করত।

দ্বীপের আবহাওয়া ভারতবর্ষের মত নয়। দিনের বেলা কড়া রোদ্দুরে দ্বীপের পাথর আর বালি গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু সূর্যাস্তের পর থেকে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করে; শেষ রাত্রে কনকনে ঠাণ্ডা।

তিতি সন্ধ্যের আগেই রান্না চড়াতো। অর্থাৎ চকমকি ঠুকে কোটরের মধ্যে আগুন জ্বালত; তারপর মাছের পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বার করে পেটের মধ্যে কী সব শিকড়-বাকড় পুরে আগুনে ঝলসাতে আরম্ভ করত। এরা সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরি করতে জানত না, কিন্তু মাছ ঝলসানোর সময় তাতে লোনা জলের ছিটে দিয়ে তাকে নোনতা করে নিতে জানত। মাছ খেতে নেহাত মন্দ হতো না। নুন আর শিকড়-বাকড়ের গন্ধ মিশিয়ে বেশ স্বাদ হতো। এক পেট মাছ খেয়ে খানিকটা ডাবের শাঁস আর জল খেতাম।

খাওয়া শেষ হলে আগুনে আরো শুকনো বালদো দিয়ে আমরা দু'জনে আগুনের দু'পাশে ঘাসের বিছানায় লম্বা হতাম। তিতি বলত—'গল্প বলো।'

তাকে আমাদের দেশের রকমারি গল্প শোনাতাম। শহর-বাজারের কথা শুনে চোখ গোল করে চেয়ে থাকত; বাঘ ভাল্লুকের গল্প শুনে বিশ্বাস করত না, এ রকম জন্তু যে থাকতে পারে তা তার ধারণার অতীত।

শেষে গল্প শুনতে শুনতে তিতি ঘুমিয়ে পড়ত। আমি উঠে নিবন্ত আগুনে আরো কাঠ দিতাম। একটা টাটি তৈরি করেছিলাম নারকেল গাছের পাতা দিয়ে, তাই দিয়ে দোর ঢাকা দিতাম, তারপর শুয়ে পড়তাম। কুঠরি শেষরাত্রি পর্যন্ত গরম থাকত।

এই ভাবে রাত কাটে। রাত্রে যখন ঘুম আসে না তখন শুয়ে শুয়ে ভাবি, কোনো দিন কি এই দ্বীপ থেকে লোকালয়ে ফিরে যেতে পারব? কি করে ফিরে যাব? এদিকে জাহাজের যাতায়াত নেই, থাকলেও জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপায় ছিল না। এই সব

ভাবতে ভাবতে হয়তো মাটি দুলে উঠত: ভাবতাম, এমনিভাবে দ্বীপ একটু একটু করে সমুদ্রে তলিয়ে যাবে, সেই সঙ্গে আমাদেরও সলিল-সমাধি হবে।

দিনের বেলা কোনো কাজ নেই। দ্বীপের কিনারে কিনারে ঘুরে বেড়াই। খিট্টার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে, সে হেঁটে হেঁটে আমার পিছনে আসে। সে এখন আমার কথা সব বুঝতে পারে, আমি কোনো হুকুম করলে তৎক্ষণাৎ তা পালন করে। আমি ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরে ঠেস দিয়ে বসি, খিট্টাকে হুকুম করি—'খিট্টা, একটা কচি ডাব পেড়ে নিয়ে আয়, তেষ্টা পেয়েছে।'

খিট্টা অমনি উড়ে গিয়ে নেয়াপাতি ডাব পেড়ে আনে। আমি বলি—'ফুটো করে দে।' খিট্টা ঠোঁটের এক ঠোকর মেরে ডাবে ফুটো করে দেয়, আমি আরামসে ডাবের জল খাই।

খিট্টার সঙ্গে ভাব হবার পর তিতি প্রায়ই আমাকে বলত—'এবার একদিন খিট্টায় চড়ে আকাশে ওড়ো না!' আমার ভয় করত, বলতাম—'আমি তোমার চেয়ে ওজনে অনেক ভারী, খিট্টা যদি আমাকে নিয়ে উড়তে না পারে? যদি সমুদ্রে ফেলে দেয়?' তিতি হেসে বলত—'না না, কোনো ভয় নেই। উড়েই দেখ না!'

একদিন মরিয়া হয়ে খিট্টার পকেটের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। পকেটের মধ্যে আঁশটে গন্ধ। কিন্তু একজনের পক্ষে যথেষ্ট জায়গা। খিট্টাকে ভয়ে ভয়ে হুকুম দিলাম—'ওড়্!' খিট্টা পাখা মেলে আকাশে উঠল। আমার বুক দুরদুর করছে। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে ভয় কেটে গেল, হৃৎকম্পন থামল। খিট্টা অনেক উঁচুতে উঠে দ্বীপের কিনারা ঘিরে চক্কর দিতে লাগল, সমস্ত দ্বীপটা একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। সে যে কী অপূর্ব অনুভূতি বলতে পারি না। আধঘণ্টা পরে খিট্টা নিজেই নেমে এল।

এই আমার প্রথম আকাশে ওড়া। তারপর আরো অনেকবার আকাশে উড়েছি, যখনই ইচ্ছে হয়েছে উড়েছি। সে আজ কত কালের কথা। এরোপ্লেন তখন কোথায়?

কিন্তু মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কোন্ দিন দ্বীপ হুস করে সমুদ্রে ডুব মারবে তার ঠিক নেই।

তবু দ্বীপের ওপর জীবনটা মন্দ কাটছে না। দ্বীপে থাকাকালে আমার সময়ের হিসেব ছিল না, কিন্তু সাত বার পূর্ণিমার চাঁদ দেখেছিলাম; মানে মোটামুটি সাত মাস সেখানে ছিলাম। শেষের দিকে কাপড়-চোপড় সব ছিঁড়ে গিয়েছিল, তাই আমিও তিতির মতন ঘাসের ঘাগরা পরতাম।

একদিন আমি আর তিতি সমুদ্রের তীরে বসে ছিলাম, তিতি বলল—'তুমি নাচতে জানো?'

বললাম—'দূর, পুরুষেরা নাচে নাকি? আমাদের দেশে মেয়েরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচে।'

তিতি বলল—'আমরা মেয়েরাও নাচি, পুরুষেরাও নাচে।'

প্রশ্ন করলাম—'তুই নাচতে জানিস?'

তিতি বলল—'হ্যাঁ জানি। দেখবে?'

তিতি উঠে দাঁড়াল, হাসি হাসি মুখে আমার পানে চেয়ে নাচতে আরম্ভ করল। ধেই ধেই নাচ নয়, হাত পায়ের নানারকম ভঙ্গী করে নাচ। ঘুঙুর নেই, বাজনা নেই, তবু খুব ভাল লাগে।

খিট্টা খানিকটা দূরে বসে ঝিমোচ্ছিল, তিতিকে নাচতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল, তারপর আধ-খোলা পাখনা মেলে পা তুলে তুলে নাচতে লাগল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

তিতি বলল—'এস না তুমিও নাচবে।'

বললাম—'আমি যে নাচতে জানি না।'

'নাচতে নাচতে শিখবে।'

তিতি উঠে দাঁড়াল। হাসি হাসি মুখে আমার পানে চেয়ে নাচতে আরম্ভ করল।

কি করি, উঠলাম। তিতি এসে আমার হাত ধরল। কল্পনা করো, নির্জন সমুদ্রতীরে একটা প্রকাণ্ড পাখি আর দু'টো মানুষ নাচছে। কিন্তু দর্শক নেই।

তারপর তিতির সঙ্গে অনেকবার নেচেছি। আমি ভালো নাচতে শিখেছিলাম। প্রাণে ফুর্তি এলে নাচা খুব শক্ত নয়। পশুপক্ষীও নাচে।

এইভাবে সাত মাস কাটার পর একটা দিন এল যেটা দ্বীপে আমার শেষ দিন। আগে জানতে পারিনি। আমার দ্বীপে আসা যেমন আকস্মিক, দ্বীপ ছাড়াও তেমনি আকস্মিক। হঠাৎ আসা হঠাৎ যাওয়া। সেই দিনটার স্মৃতি কাঁটার মত আজও বুকে বিঁধে আছে।

রাত্তিরে খুব ভূমিকম্প হয়ে গেছে, আধ ঘণ্টা ধরে দ্বীপ দুলছে। সকালবেলা কোটর থেকে বেরিয়ে দেখি অর্ধেক দ্বীপ লোপাট; দু'চারটে নারকেল গাছ ছাড়া আর সব অদৃশ্য হয়েছে, কেবল দ্বীপের পাথুরে মাথাটা জেগে আছে।

খিট্টা আমাদের দেখে প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠল; মনে হল সে ভয় পেয়েছে। আমি তিতির মুখের পানে তাকালাম; তার মুখে মৃত্যুভয়ের ছায়া। নিজের মুখটা যদি দেখতে পেতাম তাহলে সেখানেও বোধহয় ওই কালো ছায়াই দেখতে পেতাম।

সেদিন দুপুর বেলা আমি আর তিতি দ্বীপের উত্তর দিকে একটা উঁচু ঢিবির ওপর গিয়ে বসেছিলাম। খিট্টাও ছিল। কাল রাত্রির ভূমিকম্পের পর সে এক মুহূর্তের জন্যে আমাদের সঙ্গ ছাড়ছিল না।

বসে বসে আলোচনা হচ্ছিল: দ্বীপ তো আর দু'চার দিনের মধ্যেই সমুদ্রে ডুব মারবে, তখন আমাদের বাঁচার উপায় কি? নারকেল গাছের লম্বা গুঁড়ি নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে ভেলা তৈরি করা

যেতে পারে। কিন্তু নারকেল গাছ কাটব কি দিয়ে? ভেলা টেনে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ভাসাবার শক্তি কি আমাদের আছে? যদি বা কোনো মতে ভাসাতে পারি, ভেলা তো নৌকা নয়, সে নিজের ইচ্ছেমত কোন্ দিকে যাবে তার ঠিক নেই। তারপর ভেলাতে ভাসতে ভাসতে খাব কি? কিছু নারকেল না হয় সঙ্গে নিলাম; খিট্টাও সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কিংবা আকাশে উড়তে উড়তে আমাদের সঙ্গে যাবে, সে মাছ ধরে এনে দেবে। কিন্তু কাঁচা মাছ খাব কি করে? নারকেলই বা ক'দিন চলবে? যদি ছ'মাস ভেসে বেড়াতে হয়!

কোনো দিক দিয়েই নিস্তার নেই। সলিল-সমাধি অনিবার্য। হতাশ চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দু'জনে পাশাপাশি বসে রইলাম।

তারপর হঠাৎ।

দেখলাম ঈশান কোণে সমুদ্র যেখানে গিয়ে আকাশে ঠেকেছে সেইখানে ছোট্ট একটি ধোঁয়ার পতাকা! চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলাম, তারপর সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে চাপা গলায় বললাম—'তিতি ছ্যাখ তো, কিছু দেখতে পাচ্ছিস্?'

তিতি দেখে বলল—'ধোঁয়ার মত লাগছে। কী ওটা?'

'জাহাজ। জাহাজ আসছে।' আমি লাফিয়ে উঠে নাচতে আরম্ভ করলাম। তিতি চোখ বিস্ফারিত করে বলল—'জাহাজ কাকে বলে?'

আমি তখন নাচ থামিয়ে তিতিকে বোঝালাম জাহাজ কাকে বলে। বললাম—'আর ভাবনা নেই, জাহাজ আমাদের নিতে আসছে। আর আমাদের ডুবে মরতে হবে না।'

ইতিমধ্যে জাহাজটাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখনো চার-পাঁচ মাইল দূরে; মানুষ দেখা যাচ্ছে না, কেবল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকবার পর বুকটা ধড়াস করে উঠল। জাহাজ দ্বীপের দিকে আসছে না, চার-পাঁচ মাইল দূর দিয়ে দ্বীপের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে চলে যাচ্ছে। সত্যিই তো! ওরা কি করে জানবে যে, এই দ্বীপে মানুষ আছে; ওরা নিজের পথে চলে যাচ্ছে। এত দূর থেকে আমাদের দেখতেও পাচ্ছে না। হায় হায়, যদি কাঠ-কুটো জমা করে আগুন জ্বালবার ব্যবস্থা করে রাখতাম! তাহলে ওরা ধোঁয়া দেখে বুঝতে পারত। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই। কাঠ-কুটো সংগ্রহ করে আগুন জ্বালতে জ্বালতে জাহাজ চলে যাবে।

হতাশ চোখে জাহাজের পানে চেয়ে বসে রইলাম। জাহাজ দ্বীপের প্রায় সামনাসামনি এসেছে, দূরত্ব মাইল তিনেকের বেশী নয়। জাহাজের ডেক দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ডেকে মানুষ আছে কিনা দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ তিতি বলল—'এক কাজ করলে হয়।'

'কি কাজ?'

'খিট্টা আমাদের জাহাজে পৌঁছে দিতে পারে।'

আমি লাফিয়ে উঠলাম—'আরে তাই তো! এ কথাটা এতক্ষণ মনে আসেনি। তিতি, তোর ভারি বুদ্ধি। খিট্টার পক্ষে আমাদের নিয়ে তিন-চার মাইল উড়ে যাওয়া কিছুই নয়।—কিন্তু—কিন্তু—'

আমি আবার বসে পড়লাম—'খিট্টা আমাদের দু'জনকে নিয়ে যাবে কি করে? আমরা দু'জন ওর পকেটে আঁটবো না।'

'দু'জনকে একসঙ্গে নিয়ে যাবে কেন? একজনকে আগে নিয়ে যাবে, তারপর ফিরে এসে আর একজনকে নিয়ে যাবে।'

'ঠিক তো, ঠিক তো। আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। তাহলে তুই আগে যা তিতি, জাহাজে পৌঁছে খিট্টাকে পাঠিয়ে দিস।'

তিতি বলল—'আমি আগে গেলে চলবে না। তুমি ওদের ভাষা জানো, তুমি আগে যাও।'

তাও তো বটে। জাহাজের লোকদের ব্যাপার বুঝিয়ে দিতে হবে, তাহলে তারা জাহাজ থামাবে; হয়তো দ্বীপের কাছে আসবে। তিতি আগে গেলে তা হবে না।

উঠে পড়লাম। খিট্টার কাছে গিয়ে বললাম—'ওই জাহাজ দেখতে পাচ্ছিস, আমাকে ওখানে নিয়ে চল।' খিট্টা ঘাড় তুলে জাহাজের পানে চাইল, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি তার পকেটে ঢুকলাম। তিতিকে বললাম—'আচ্ছা তিতি, আমি গিয়েই খিট্টাকে পাঠিয়ে দেবো।'

তিতি হেসে ঘাড় নাড়ল। তখনো জানি না তিতির সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা, ইহজীবনে আর দেখা হবে না।

খিট্টা দু'চার বার পাখনা নেড়ে আকাশে উঠল; জাহাজের দিকে মুখ করে সোজা উড়ে চলল। বেচারা খিট্টা।

আমি খিট্টার পকেটের মধ্যে বসে নানান রংবেরঙের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম; খিট্টাকেও যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, খিট্টাকে দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করব। তখন আমাদের পায় কে! হায় খিট্টা।

খিট্টা জাহাজের দিকে এগিয়ে চলেছে। জাহাজও দাঁড়িয়ে নেই; তবু দেখতে দেখতে জাহাজের চেহারা বড় হচ্ছে। প্রথমে ছিল মোচার খোলার মতন, তারপর পানসির মতন, ক্রমে আরো বড়। এবার জাহাজের ডেকের ওপর মানুষ দেখতে পাচ্ছি, ইউনিফর্ম পরা মানুষগুলো ছুটে আসছে ডেকের কিনারায়, রেলিং-এর ধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি জাহাজ অত চিনি না, কিন্তু মনে হল এটা মানোয়ারী জাহাজ; তার মেজের দিকে পতাকা উড়ছে, সাদা জমির ওপর লাল চাকতি।

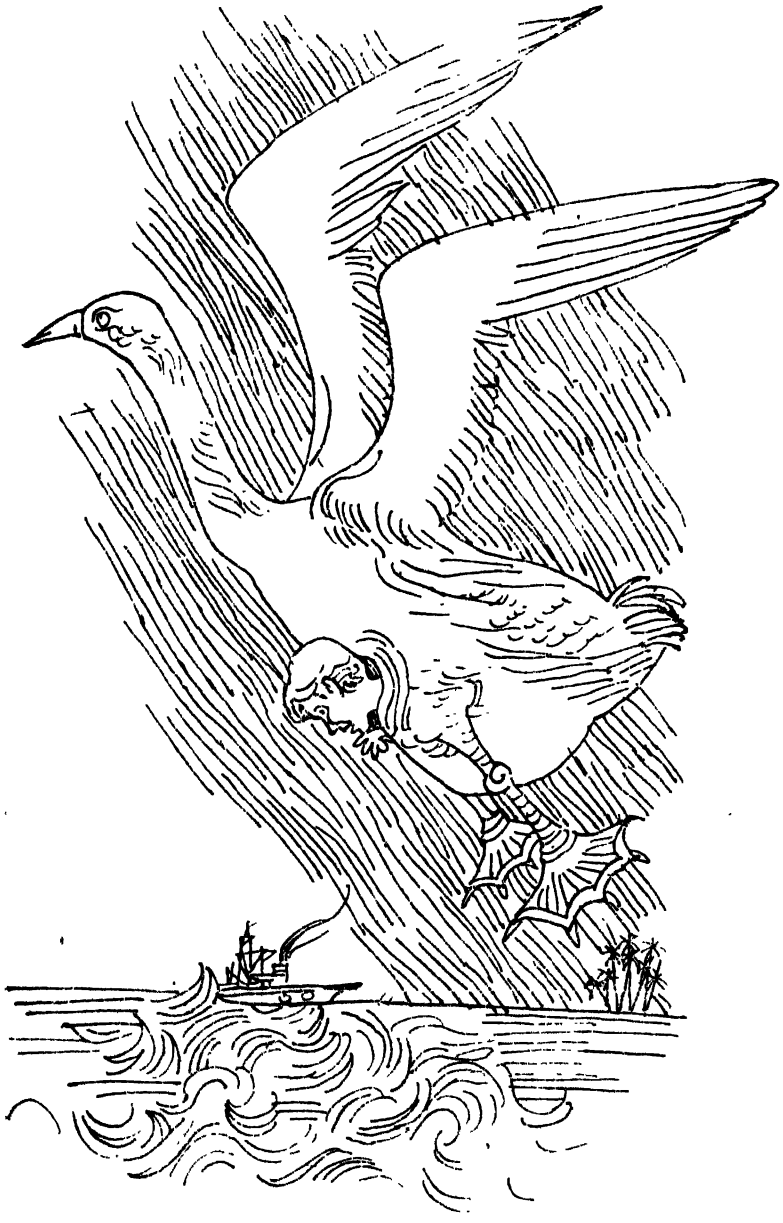

খিট্টা জাহাজের দিকে এগিয়ে চলেছে। জাহাজও দাঁড়িয়ে নেই।

আমরা জাহাজের পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেছি, খিট্টা জাহাজের খোলা ডেকের দিকে নামতে শুরু করেছে এমন সময় সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। জাহাজ থেকে দুম্ করে একটা শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে খিট্টা প্যাঁক করে ডেকে উঠল ; তারপর সোজা নীচের দিকে পড়তে লাগল। তোমরা পাখি শিকার করেছ, উড়ন্ত পাখি বুকে গুলি খেয়ে যেভাবে পড়ে খিট্টা ঠিক সেই ভাবে পড়তে লাগল।

কী হল ভাল ভাবে ধারণা করবার আগেই জলে পড়লাম। পড়ার বেগে খিট্টার সঙ্গে সমুদ্রে তলিয়ে গেলাম। তারপর হাঁচোড়-পাঁচোড় করে খিট্টার পকেট থেকে বেরিয়ে ভেসে উঠলাম। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই, জলে পড়ার সময় মাথায় চোট লেগেছিল, কেমন যেন ধন্দ লেগে গিয়েছিল। আবছা ভাবে দেখলাম জাহাজ থেকে জালি-বোট নামছে। জালি-বোট এসে আমাকে জল থেকে টেনে তুলল। তারপর কিছু মনে নেই, বোধহয় কয়েক মিনিটের জন্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

জ্ঞান হয়ে দেখি জাহাজের ডেকের ওপর শুয়ে আছি, আমাকে ঘিরে একদল ফৌজি পোশাক-পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সব মনে পড়ে গেল, আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু মানুষগুলোর মুখ দেখে মনে হল এরা যেন স্বাভাবিক নয়। তারপরই বুঝতে পারলাম, এরা জাপানী ; জাহাজটা জাপানী জাহাজ।

আমি তখন ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে চিৎকার করে বললাম—'ও জাপানী সায়েব, তোমরা এ কি সর্বনাশ করলে! খিট্টাকে গুলি করে মেরে ফেললে কেন? তিতি এখন জাহাজে আসবে কি করে?'

জাপানীরা কেউ কথা বলল না, বাদামের মত চোখ মেলে আমার পানে চেয়ে রইল। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল, পাগলের মত

লাফাতে লাফাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে চিৎকার করতে লাগলাম—'থামাও থামাও, শীগগির জাহাজ থামাও। তিতিকে ফেলে কোথায় চলে যাচ্ছ! খিট্টা মরে গেছে, এখন কে তাকে মাছ ধরে খাওয়াবে, কে গাছ থেকে নারকেল পেড়ে দেবে? তিতি যে না খেয়ে মরে যাবে। তোমরা কেমন লোক, বুঝতে পারছ না!'

তখন একজন জাপানী অফিসার আমার হাত ধরে ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে নিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন বয়স্থ মানুষ, অল্প ইংরেজি জানেন; কিন্তু চোয়ালের হাড় লোহার মত শক্ত। তখন রুশ-জাপানের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

আমি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ক্যাপ্টেনকে সব কথা বললাম। শুনে ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন—'এত বড় পাখি সভ্য জগতে কেউ কখনো দেখেনি, তাই একজন নাবিক ভয় পেয়ে তাকে গুলি করে মেরেছে। যাহোক, আমরা বিশেষ সামরিক কাজে যাচ্ছি, এখন আর দ্বীপে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বীপের অক্ষাংশ দ্রাঘিমা নোট করে নেওয়া হয়েছে। পরে এই দ্বীপে অনুসন্ধান করব।'

জিজ্ঞেস করলাম—'সাহেব, কবে দ্বীপে ফিরে আসবে?'

জাপানী ক্যাপ্টেন বললেন—'এখন যুদ্ধ চলছে, কিছুই বলা যায় না।'

তারপর ক্যাপ্টেনকে অনেক মিনতি-স্তুতি করলাম, কিন্তু ফল হল না। ওদের কাছে তিতির জীবনের কোনো মূল্য নেই।

দু'হপ্তা পরে একটা অন্ধকার রাত্রে জাপানী জাহাজ আমাকে মালয় দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমি সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে গেলাম, তারপর দেশে ফিরে এলাম।

তিতিকে যখন মনে পড়ে বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। বড়

ভাল মেয়ে ছিল। যদি দেশে আনতে পারতাম তাকে বিয়ে করতাম।

রণদামামা চুপ করলেন। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতার মধ্যে রণদামামার গভীর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম।

নন্দনগড় রহস্য

পঙ্কজ বাঙালী আর হনুমন্ত সিং বেহারী। ম্যাট্রিক পাস করে দু'জনে পাটনার কলেজে ভরতি হয়েছিল, একই হস্টেলের একই ঘরে জায়গা পেয়েছিল। পঙ্কজ পড়তে এসেছিল হাজিপুর থেকে, আর হনুমন্ত এসেছিল নন্দনপুর নামে এক গ্রাম থেকে। এক ঘরে থাকার ফলে দু'জনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। পঙ্কজ হনুমন্তকে হনু বলে ডাকত, হনু পঙ্কজকে বলত—পাংখা।

পঙ্কজের চেহারা সাধারণ বাঙালী ছেলের মতন: লম্বা একহারা শরীর, চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ; সে লেখাপড়ায় ভাল, আবার খেলাধূলাতেও ওস্তাদ। হনুমন্তর চেহারা রাজপুত্রের মতন; টকটকে রং, মুখশ্রীর তুলনা নেই; লেখাপড়ায় একটু নরম, কিন্তু হকি ফুটবল ক্রিকেট সব খেলাতেই আছে।

কলেজের হস্টেলে বছরখানেক কাটবার পর গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়ল। পঙ্কজ হনুমন্তকে জিজ্ঞেস করল—'হনু, গরমের ছুটিতে গাঁয়ে গিয়ে কি করবি?'

হনু একটু লজ্জিতভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—'কি আর করব, খাব ঘুমোব কবড্ডি খেলব—।'

পঙ্কজ তার মুখের ভাব লক্ষ্য করেছিল, তার পাশে গিয়ে বসল, বলল—'আর কী?'

'আর কিছু না। পাংখা, তুইও আমার সঙ্গে গাঁয়ে চল না। দু'জনে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব, পাখি শিকার করব—'

'পাখি শিকার করব কি দিয়ে—লাঠি দিয়ে?'

'না না, আমার বাবার বন্দুক আছে, দোনলা বন্দুক।'

'তাই নাকি আচ্ছা তাহলে যাব। কিন্তু তুই গাঁয়ে গিয়ে আর কি করবি?'

হনু হেসে ফেলল—'বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন, এই ছুটির মধ্যেই বিয়ে হবার কথা।'

'অ্যাঁ—বলিস কি। এরি মধ্যে বিয়ে। তোর বয়স কত?'

'আঠারো। আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। কিন্তু কি করব, আমাদের বংশের এই রেওয়াজ।'

যে সময়ের কাহিনী তখনো ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয়নি, স্বাধীনতার হাওয়া আমাদের গায়ে লাগেনি।

পঙ্কজ বলল—'হুঁ। বউকে দেখেছিস?'

'দূর, বিয়ের আগে কি বউকে দেখতে আছে। ভিন্ গাঁয়ের মেয়ে। শুনেছি লেখাপড়া জানে না, খাজা মুখ্খু। তুই চল না ভাই, তুই যদি বাবাকে বলিস আমার ইচ্ছে নেই, বাবা নিশ্চয় তোর কথা শুনবেন।'

'আচ্ছা যাব।'

পঙ্কজ নিজের বাড়িতে চিঠি লিখে দিল, তারপর ছুটি আরম্ভ হলে দুই বন্ধু নন্দনপুর গ্রামে চলল।

পাটনা থেকে গয়া লাইনে মাইল পঁচিশেক গেলে ছোট্ট একটি স্টেশন পড়ে, এইখানে ট্রেন থেকে নামতে হয়। তারপর পাঁচ মাইল গরুর গাড়ির রাস্তা।

হনুমন্তর বাবা গরুর গাড়ি পাঠিয়েছিলেন, গরুর গাড়ির পুরনো গাড়োয়ান ছেদিরাম গোয়ালা প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছিল। আরো কয়েকজন যাত্রী উপস্থিত ছিল। পঙ্কজ আর হনুমন্ত যে কামরা থেকে নামল সেই কামরাতে একটি পরিবার উঠল; স্বামী-স্ত্রী এবং একটি দশ-এগারো বছরের ফুটফুটে মেয়ে। হনুমন্ত তাদের চেনে না, সে তাদের পানে এক নজর তাকাল। তারা কামরায়

গিয়ে বসল, গাড়ি ছেড়ে দিল।

ছেদিরাম চোখ মটকে বলল—'হনুমন্ত-ভাইয়া, কেমন ঢুল্‌হন্ দেখলে?'

হনুমন্ত অবাক হয়ে বলল—'ঢুল্‌হন্! বউ! কোথায়?'

ছেদিরাম বলল—'বাঃ দেখলে না! শ্যামনন্দন সিং তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে রামদুলারীকে নিয়ে গয়ায় পুজো দিতে গেল। ওই মেয়েই তো তোমার হবু বউ।'

হনুমন্ত নাক সিঁটকে বলল—'ওই পুচকে মেয়েটা! রাম রাম!'

পঙ্কজ হেসে বলল—'দেখতে কিন্তু ভারী সুন্দর। তোর সঙ্গে খুব মানাবে।'

'হুঁ, ঐটুকু বেরালছানার মত মেয়ে আমি বিয়ে করব না।' হনুমন্ত মুখ গোমড়া করে গরুর গাড়িতে উঠে বসল। পঙ্কজ আর কিছু বলল না, গাড়িতে উঠল। মালপত্র তুলে নিয়ে ছেদিরাম গাড়ি ছেড়ে দিল।

পাথুরে রাস্তা, চারিদিকের দৃশ্য পাথুরে, উঁচুনীচু ঢেউখেলানো জমি, সামনে দূরে ছোট ছোট লম্বাটে ধরনের পাহাড় কুমিরের মতন পড়ে আছে, তাদের ফাঁকে ফাঁকে চাষের জমি। গাছপালা গ্রীষ্মের তাপে শুকিয়ে গেছে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে তারা গ্রামে এসে পৌঁছুল। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম, প্রায় আড়াইশো ঘর মানুষের বাস। বেশির ভাগই ভুঁইয়া রাজপুত, তাছাড়া দু-চার ঘর কামার কুমোর ময়রা গয়লা ছুতোর নাপিত আছে। গ্রামটি ভারী শ্রীমন্ত; একটি প্রকাণ্ড দীঘিকে ঘিরে লোকালয় গড়ে উঠেছে। কতদিনের পুরনো দীঘি কেউ বলতে পারে না; চারটি পাড়ে পাথর বাঁধানো ঘাট, মাঝখানে কাকচক্ষু জল টলটল করছে। অতিবড় অনাবৃষ্টির বছরেও দীঘির জল শুকোয় না।

হনুমন্তদের বাড়িটা দীঘির পশ্চিম দিকের ঘাটের ঠিক সামনে। সেকেলে গড়নের দোতলা বাড়ি, ছোট ছোট জানালা দরজা, মোটা মোটা কপাটের ওপর লোহার গুল বসানো। যেন ছোটখাটো দুর্গ।

গরুর গাড়ি গিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই হনুমন্তর বাবা রঘুবীর সিং বেরিয়ে এলেন। হনুমন্তর চেহারা যদি হয় রাজপুত্রের মতন, রঘুবীর সিং-এর চেহারা রাজার মতন। বয়স পঁয়তাল্লিশ, প্রসন্ন মুখ। তিনি এসে দাঁড়ালে হনুমন্ত পঙ্কজের পরিচয় দিল। তিনি হাসিমুখে বললেন—'এস বাবা। গরুর গাড়ির হট্‌রানিতে নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে।'

দু'জনের কাঁধে দু'হাত রেখে তিনি তাঁদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। হনুমন্ত মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দোতলায় চলে গেল। নীচের তলার একটা ঘরে পঙ্কজকে নিয়ে গিয়ে রঘুবীর সিং বললেন, 'এই ঘরে তোমরা দুই বন্ধু থাকবে।'

ঘরে পাশাপাশি দু'টি খাট পাতা। একটি চৌকির ওপর খুঞ্চিপোশ ঢাকা খাবারের স্তূপ।

কিছুক্ষণ পরে হনুমন্ত ফিরে এল। দু'জনে খেতে বসল। নানা রকম খাবার: কচুরি সিঙাড়া বালুসাই গুলাব্‌জামুন মোতিচুর। দু'জনে পেট ভরে খেল। খাওয়া শেষ হলে হনুমন্ত বলল—'চল্ পাংখা, তোকে আমাদের গ্রাম দেখিয়ে আনি।'

তখন বেলা এগারোটা বেজে গেছে, মাথার ওপর কড়া রোদ্দুর; কিন্তু রোদ্দুর ওদের গায়ে লাগে না। দুই বন্ধু গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ বেড়ালো। মাটকোঠা একটা বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেল মেয়েলী গলার কান্নার আওয়াজ। হনুমন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাড়ির সামনে কেউ নেই। একটি বুড়ো লোক লাঠি ধরে

রাস্তা দিয়ে আসছিল। হনুমন্ত তাকে জিজ্ঞেস করল—'মাহতো, ফেকুরামের বাড়িতে কান্নাকাটি কিসের?'

মাহতো চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'ফেকুরাম পরশু সকালে পাটনা গিয়েছিল, কাল রাত্তিরে ফিরে আসবার কথা ছিল কিন্তু ফেরেনি। আজ সকালে তার বেউ বম্‌বম্‌দাস বাবাজীর কাছে গিয়েছিল, বাবা ইশারায় জানিয়েছেন যে ফেকুরাম মরে গেছে।'

হনুমন্ত কি বলবে ভেবে পেল না, বুড়ো মাহতো নিজে থেকেই বলে চলল—'ফেকু হঠাৎ বড়লোক হয়েছিল, দু'বছরে দশ বিঘে জমি কিনেছিল, বউকে সোনার গহনা দিয়েছিল। অত সুখ কি সহ্য হয়?' বুড়ো লাঠি ঠুকঠুক করে চলে গেল।

দুই বন্ধু আবার চলতে শুরু করল। যেতে যেতে পঙ্কজ জিজ্ঞেস করল—'বম্‌বম্‌দাস বাবাজী কে?'

হনুমন্ত বলল—'একজন সাধু। গ্রামের কিনারায় থাকেন। মৌনী সাধু, কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, কেবল মাঝে মাঝে বম্‌বম্‌ করেন। চল্‌ তোকে দেখাই।'

সাধুদের ওপর পঙ্কজের ভক্তি ছিল না, সে একটু ঠাট্টার স্বরে বলল—'সাধুবাবা বুঝি ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারেন?'

হনুমন্ত বলল—'দূর, সে রকম সাধু নয়। কারুর সঙ্গে কথাই বলেন না, জপতপ নিয়ে থাকেন। তবে কেউ গুরুতর প্রশ্ন নিয়ে ওঁর কাছে গেলে উনি ইশারায় জানিয়ে দেন।'

গ্রাম পেরিয়ে কিছুদূর পুবদিকে গেলে একটা আমবাগান পড়ে। সেই আমবাগানে প্রকাণ্ড আমগাছের তলায় একটা চালাঘর; ঘরের সামনে এক গাদা ছাই-এর ওপর ধুনি জ্বলছে, ধুনির সামনে বসে আছেন বম্‌বম্‌দাস বাবাজী। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, বেশী দাড়ি গোঁফ নেই, মাথার কাঁচাপাকা চুল কাঁধ পর্যন্ত এসেছে, কপালে ভস্মটিকা। মুখের ভাব শান্ত, চোখে স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টি।

একগাদা ছাইয়ের উপর ধুনি জ্বলছে। ধুনির সামনে
বসে আছেন বম্‌বম্‌দাস বাবাজী।

হনুমন্ত গিয়ে প্রণাম করল, পঙ্কজও হাত জোড় করে মাথা নোয়াল। বাবা হাসি-হাসি মুখে দু'জনের পানে চাইলেন। হনুমন্ত বলল—'আজ গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। এ আমার কলেজের বন্ধু।—বাবা, ফেকুরাম নাপিত কি মরে গিয়েছে?'

বাবার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তিনি স্থির হয়ে বসে রইলেন, উত্তর দিলেন না। পঙ্কজ হঠাৎ প্রশ্ন করল—'সামনের পরীক্ষায় আমরা পাস করতে পারব কি?'

বাবার মুখ আবার প্রফুল্ল হল। এবারো তিনি উত্তর দিলেন না, কেবল চোখ তুলে উঁচু দিকে চাইলেন।

এই সময় একটু আশ্চর্য রকমের ব্যাপার ঘটল। বাগানের গাছে গাছে আম ফলে ছিল, চারদিকে পাকা ফলের গন্ধ ভরভর করছিল; হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে গাছের ডালপালা নাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'টি রং-ধরা সোনালী আম গাছ থেকে খসে মাটিতে পড়ল, তারপর গড়াতে গড়াতে ধুনির পাশে এসে স্থির হল। বাবাজী আম দু'টি তুলে দুই বন্ধুর হাতে দিলেন, কৌতুক-ভরা চোখে চেয়ে হাত তুলে তাদের বিদায় দিলেন। বললেন—'বম্ বম্!'

দু'জনেরই যেন ধন্ধ লেগে গিয়েছিল, তারা যন্ত্রের মতন কয়েক পা গিয়ে পরস্পরের মুখে চেয়ে বোকাটে হাসি হাসল। তারপর হনুমন্ত উত্তেজিত চাপা গলায় বলল—'বুঝতে পারলি? আমরা দু'জনেই পরীক্ষায় পাস করব এই কথা বাবা ইশারায় জানিয়ে দিলেন।'

পঙ্কজ বিবেচনা করে বলল—'তাই হবে। একটা বড় ভুল হয়ে গেল, বাবাকে জিজ্ঞেস করলে হতো তোর বিয়ে কবে হবে।'

হনুমন্ত বলল—'না না, বাবাকে ওসব বাজে প্রশ্ন করলে বাবা রেগে যান।—চল্ তোকে একটা মজার জিনিস দেখাই।'

'কী মজার জিনিস?'

'আমাদের রাজবাড়ি। নন্দনগড়ের রাজবাড়ি।'

'সে আবার কি?'

'আমার পূর্বপুরুষেরা এক সময় এই তল্লাটের রাজা ছিলেন। আজ রাত্তিরে বাবার মুখে গল্প শুনিস্।'

আমবাগানের ওপারে খানিকটা পাথুরে মাঠ, তারপর হঠাৎ মাঠ শেষ হয়ে গেছে। মাঠের কিনারায় একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, তারপরেই অতলস্পর্শ খাদ। প্রায় একশো গজ চওড়া আর দেড়শো গজ লম্বা জায়গা ধসে গিয়ে একটা বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করেছে। গহ্বরের চার পাশ খাড়া উঁচু, শক্ত পাথর দিয়ে তৈরী, নীচে নামার কোনো রাস্তা নেই।

তেঁতুল গাছটা খাদের ওপর খানিকটা ঝুঁকে আছে, তার একটা ডাল ধরে পঙ্কজ নীচের দিকে উঁকি মারল। পঞ্চাশ-ষাট গজ নীচে খাদের অসমতল জমির ওপর ঝোপঝাড় গজিয়েছে, এখানে ওখানে চাপ চাপ পাথরের ঢিপি পড়ে আছে, তার মধ্যে দূরের একটা ঢিপি বেশ উঁচু। এখান থেকে কেউ যদি নীচে পড়ে যায় তার নির্ঘাত মৃত্যু।

পঙ্কজ বলল—'কই, রাজবাড়ি কোথায়?'

হনুমন্ত বড় ঢিপির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—'ওইখানে রাজবাড়ি ছিল, এখন মাটি চাপা পড়েছে। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি, অনেক বছর আগে এখানে ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছিল, রাজবাড়িসুদ্ধ সমস্ত দুর্গ মাটির নীচে তলিয়ে গিয়েছিল। আমার সব কথা ভাল মনে নেই, তুই যদি শুনতে চাস রাত্তিরে পিতাজীকে জিজ্ঞেস করিস, পিতাজী জানেন। আমাদের পূর্বপুরুষ নাকি পুঁথি লিখে গিয়েছিলেন, সেই তালপাতার পুঁথি আমাদের বংশে আছে।'

দু'জনে বাড়ি ফিরে এল, দীঘিতে স্নান করে খেতে বসল। দোতলায় খাবার ঘর, রঘুবীর সিং দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে খেতে

বসলেন; হনুমন্তর মা পরিবেশন করলেন। মোটাসোটা ফরসা মানুষটি। হাসিভরা মুখে প্রকাণ্ড মুক্তোর নথ।

খেতে খেতে হনুমন্ত জিজ্ঞেস করল—'বাবুজী, ফেকুরাম নাপিত কি সত্যিই মরে গেছে?'

রঘুবীর বললেন—'কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কিছুদিন থেকে ফেকুরামের চালচলন বদলে গিয়েছিল। আগে ফেকু গাঁয়ের লোকের চুল ছেঁটে দাড়ি কামিয়ে যা দু-চার পয়সা পেত তাতেই কষ্টেসৃষ্টে পেট চালাত। তারপর হঠাৎ সে পাটনায় যেতে আরম্ভ করল; যেদিন যায় তার দু'দিন পরে ফিরে আসে। দেখতে দেখতে তার অবস্থা ফিরে গেল। গাঁ-সুদ্ধ লোকের চোখ টাটালো; কিন্তু কেউ বুঝতে পারল না ফেকু কোথা থেকে টাকা নিয়ে আসে। আমার বিশ্বাস ফেকু পাটনায় কোনো চোর-ডাকাতের দলে মিশেছিল। শেষ পর্যন্ত অধর্মের ফল ফলল। ফেকু হয়তো পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে কিংবা ডাকাতের দল তাকে খুন করেছে। কিছুই বলা যায় না। তবে মৌনীবাবা নাকি জানিয়েছেন ফেকু বেঁচে নেই। তাই হবে; বাবার কথা কখনো মিথ্যে হয় না। দু-চার দিনের মধ্যেই পাকাপাকি জানা যাবে।'

আর কোনো কথা হল না এ বিষয়ে। পঙ্কজ বলল—'রাজবাড়ির গহ্বর দেখে এসেছি। রাত্তিরে আপনার কাছে গল্প শুনব।'

রঘুবীর খুশী হয়ে বললেন—'বেশ বেশ, সন্ধ্যের পর চবুতরায় বসা যাবে।'

দুপুর বেলাটা দুই বন্ধু নিজের নিজের খাটে শুয়ে কাটাল, তারপর উঠে খানিকক্ষণ দাবা খেলল। সূর্যাস্ত হতে বেশী দেরি নেই দেখে পঙ্কজ বলল—'চল্ হনু, বেড়িয়ে আসি। দুপুরের খাওয়া এখনো হজম হয়নি।'

হনুমন্ত বলল—'তা চল্। কোন্ দিকে যাবি?'

'রাজবাড়ির দিকে।'

'রাজবাড়ির গর্ত তো দেখলি, আর কী দেখবি?'

'আবার দেখব। জায়গাটা বড় ভাল লেগেছে।'

দু'জনে বেরুল, রাজবাড়ির খাদের কাছে গিয়ে তেঁতুলতলায় বসল। সূর্য তখনো অস্ত যায়নি, কিন্তু ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের তলায় অন্ধকার। নীচে গহ্বরের তল পর্যন্ত দেখা যায় না; কালো জলের মতন অন্ধকার ভরে ভরে উঠেছে, মনে হয় সূর্যাস্ত হলে গহ্বর কানায় কানায় কালো জলে ভরে উঠবে। পঙ্কজ সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

'কি ভাবছিস্?'

'ভাবছি, কত কাল আগে এখানে একদল মানুষ বাস করত, সন্ধ্যে হলে চারিদিকে আলো জ্বলে উঠত, রাজবাড়ির মেয়েপুরুষ নানা কাজে ঘুরে বেড়াতো···কেমন ছিল তাদের জীবন, তারা কী ভাবত, কী কাজ করত···যেদিন ভূমিকম্প হয় সেদিন তারা কে কী করছিল—'

পঙ্কজ আপন মনে বলে চলল। এলোমেলো কল্পনার খেলা। সে ইতিহাসের ছাত্র, অতীতের কথা ভাবতে তার ভাল লাগে। আহা, মূক অতীত যদি কথা কইতে পারত! কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত—

কিছুক্ষণ তার কল্পকথা শোনবার পর হনুমন্ত হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল, তার হাত ধরে টেনে বলল—'নে ওঠ, এবার বাড়ি যাই। পাঁচশো বছর আগে যারা মরে গেছে তাদের কথা ভেবে কি হবে?'

পঙ্কজ বলল—'তুই একটা আস্ত হনু।'

বাড়ি ফিরে গিয়ে তারা দেখল ভাঙের শরবত তৈরি হয়েছে, দই মিছরি গোলমরিচ শসার বিচি দিয়ে অপূর্ব ঠাণ্ডাই শরবত। গ্রীষ্মকালে এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে, রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়। হনুমন্ত বড়

এক ঘটি ঠাণ্ডাই নিজেদের ঘরে নিয়ে এসে বলল—'আয়।'

দু'জনে বসে বসে ঘটি শেষ করল। চাকরেরা ঘরে ঘরে কেরোসিন লণ্ঠন রেখে গেছে, ধূপধুনো দিচ্ছে। দোতলার ঠাকুরঘরে ঠাকুরের শীতলভোগ হচ্ছে, শাঁখ ঘড়ি-ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পঙ্কজের মনে হল সে কতকাল আগেকার ভারতবর্ষে ফিরে গিয়েছে।

চাকর এসে জানালো, মালিক চবুতরায় তলব করেছেন। দু'জনে উঠে বাইরে গেল।

বাড়ির সামনে শানবাঁধানো গোল চত্বর, তার ওপর জাজিম পাতা হয়েছে, দু'টি মোটা তাকিয়ার মাঝখানে রঘুবীর সিং বসেছেন; হাতে গড়গড়ার নল, গয়ার তামাকের অম্বুরী গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রঘুবীর সিং-এর গায়ে মিহি মলমলের আংরাখা, কানে কুণ্ডল, গলায় হার। তাঁকে সেকালের রাজার মতন দেখাচ্ছে। আকাশে চাঁদ আছে, বেশ গোলগাল চাঁদ। তারই আলোয় পঙ্কজ আর হনুমন্ত রঘুবীর সিং-এর সামনে গিয়ে বসল।

রঘুবীরও ঠাণ্ডাই খেয়েছিলেন, তাঁর মন প্রফুল্ল, মুখে প্রসন্ন হাসি। তিনি বললেন—'আমি হনুমন্তর বিয়ে ঠিক করেছি; পাশের গাঁয়ের শ্যামনন্দন ভারী গৃহস্থ, তারই মেয়ে। শ্রাবণ মাসে বিয়ে দেবো। পঙ্কজ, তোমাকে কিন্তু আসতে হবে।'

পঙ্কজ চকিতে হনুমন্তর দিকে চেয়ে দেখল সে ঘাড় হেঁট করে আছে। পঙ্কজও ঘাড় হেঁট করে দ্বিধা ভরে বলল—'আজ্ঞে।'

রঘুবীর তার দ্বিধা লক্ষ্য করলেন না, বললেন—'তুমি নন্দনগড়ের গল্প শুনতে চাইছিলে, তাহলে বলি শোন। কয়েকবার গড়গড়ার নলে টান দিয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন—

আজ থেকে আন্দাজ পাঁচশো বছর আগে এখানে নন্দনগড় নামে

একটি রাজ্য ছিল। ছোট রাজ্য, আজকাল একটা জেলার আয়তন যতখানি, ততখানি জায়গা নিয়ে রাজ্য। আশেপাশে এমনি ছোট ছোট রাজ্য আরো আছে। তখন মোগলেরা ভারতবর্ষে ঢুকেছে, মোগল-পাঠানে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে গেছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। তার মধ্যে ছোট ছোট হিন্দু রাজ্যগুলি কোনোমতে টিকে আছে।

যাঁরা নন্দনগড় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন রাজপুত ক্ষত্রিয়, কোন স্মরণাতীত যুগে রাজস্থান থেকে বেরিয়ে পুবদিকে এসে এই পার্বত্য এলাকায় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, রাজ্যের মাঝখানে পাথর দিয়ে দুর্গ রচনা করেছিলেন। এই দুর্গই ছিল একাধারে তাঁদের রাজপুরী এবং রাজধানী।

রাজস্থান ছেড়ে আসার পরও রাজপুতেরা নিজেদের সাবেক রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ছাড়েননি। শরৎকালে হরিণ বরাহ মারবার জন্যে শিকারে বেরুতেন, বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগে থাকত। মাঝে মাঝে পড়শী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যেত। ছেলে-মেয়ের বিয়ে হতো জাতের মধ্যে ; এক রাজার ছেলের সঙ্গে অন্য রাজার মেয়ের।

এমনিভাবে কত শতাব্দী কেটে গেল তার ঠিক নেই। তারপর হঠাৎ একটা দিন এল যে-দিনটা নন্দনগড় রাজ্যের শেষ দিন। হঠাৎ ভাগ্যবিপর্যয় হল, একমুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল।

সে সময় যিনি নন্দনগড়ের রাজা ছিলেন তাঁর নাম ছিল বলবন্ত সিং। আমার পূর্বপুরুষ যশবন্ত সিং ছিলেন রাজার ছোট ভাই। রাজপরিবারের আশি জন স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে দুর্গে বাস করতেন।

রাজা বলবন্ত সিং-এর বড় ছেলে যুবরাজ কুমার সিং-এর বিয়ে ঠিক হয়েছে পাশের একটি রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে। একমাস ধরে রাজ্যে হইহই আমোদ আহ্লাদ উৎসব চলল। তারপর যুবরাজ

লোক-লশকর নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে গেলেন।

সাতদিন পরে যুবরাজ বিয়ে করে ফিরলেন, সঙ্গে চতুর্দোলায় বউ। অপরূপ সুন্দরী বউ, যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। আবার রাজ্যে উৎসব শুরু হল।

দু'হপ্তা ধরে হইহই চলবার পর উৎসব যখন ঝিমিয়ে এসেছে, দূরের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা একে একে বিদায় নিচ্ছে, সেই সময় আমার পূর্বপুরুষ যশবন্ত সিং-এর খেয়াল হল তিনি শিকারে যাবেন। দু'মাস ধরে ভোজ চলেছে। ছাগল ভেড়া সব শেষ হয়ে গেছে, জঙ্গল থেকে হরিণ মেরে আনতে হবে।

কুড়ি জন সঙ্গী নিয়ে যশবন্ত সিং বেরুলেন। হাতে বল্লম, কাঁধে ধনুক। পুব দিকের পাহাড় পার হলেই প্রকাণ্ড জঙ্গল, সেখানে হরিণ তো আছেই, বাঘ-ভাল্লুকও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

ওঁদের ইচ্ছে ছিল দু'দিন ধরে জঙ্গলে শিকার খেলবেন। তারপর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা শিকার নিয়ে ফিরে আসবেন। তখন হেমন্তকাল, গাছে সবুজ পাতা, মাটিতে সবুজ ঘাস। প্রথম দিন তাঁরা খুব শিকার খেললেন, কয়েকটা হরিণ ও ময়ূর মারলেন। রাত্রি হলে হরিণ আর ময়ূরের মাংস সিক-কাবাব করে খেলেন। তারপর কচি ঘাসের বিছানায় শুয়ে পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়লেন।

দুপুর রাত্রে হঠাৎ তাঁদের ঘুম ভেঙে গেল, তাঁরা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। মাটি দুলছে, চারিদিকের গাছ মড়মড় শব্দে ডালপালা নাড়ছে, ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে, মাটির তলা থেকে বিকট গড়গড় ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে। প্রথমটা কেউ বুঝতেই পারে না কী হচ্ছে, তারপর বুঝল—ভূমিকম্প!

সে কী ভূমিকম্প! সারা পৃথিবী যেন তোলপাড় হচ্ছে। যে দাঁড়িয়ে উঠেছে সে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, যে শুয়ে আছে সে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এমন ভয়ংকর ভূমিকম্প এ তল্লাটে কখনো হয়নি।

অনেকক্ষণ এইভাবে চলবার পর আস্তে আস্তে ভূমিকম্পের বেগ কমে এল, তারপর মাটি স্থির হল।

যশবন্ত সিং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বসে আছেন; চারিদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার। রাত্রি কত তাও জানার উপায় নেই; বনের মধ্যে প্রহরের ঘণ্টা বাজে না। সকলের মন বাড়ি ফেরার জন্যে অধীর হয়েছে; না জানি সেখানে কী হচ্ছে। সকলেরই স্ত্রী-পুত্র পরিবার আছে। কিন্তু এই অন্ধকারে পথ চিনে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

অবশেষে রাত কাটল। পুবের আকাশে দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যশবন্ত সিং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়া ছোটালেন। জঙ্গল থেকে নন্দনগড়ের দূরত্ব যদিও পাঁচ-ছয় ক্রোশের বেশী নয়, তবু মাঝখানে পাহাড়, সংকটপথে ঘুরে ফিরে সাবধানে ঘোড়া চালাতে হয়। তাঁরা যখন পৌঁছলেন তখন বেলা দুপুর।

নানা রকম আশা আশঙ্কা নিয়ে তাঁরা ফিরেছেন, কিন্তু ফিরে এসে যা দেখলেন তাতে তাঁদের বুকের স্পন্দন প্রায় থেমে গেল। নন্দনগড় দুর্গ আর নেই, তার জায়গায় বিরাট একটা হ্রদ তার ঘোলা জল নিয়ে টলমল করছে। ভূমিকম্পের ফলে দুর্গ অতলে তলিয়ে গিয়েছে, আর মাটির তলা থেকে অন্তঃসলিল উঠে এসে গহ্বরটাকে কানায় কানায় ভরে দিয়েছে। দুর্গ এবং দুর্গের আশেপাশে যারা ছিল, তারা একজনও বেঁচে নেই, যারা চাপা পড়েনি তারা ডুবে মরেছে। সপুরী একগড়।

তখন যশবন্ত সিং-এর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর, তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে রাজবাড়িতে ছিল, সবাই মরেছে। যশবন্তের সঙ্গীদের অবস্থাও তাই, সবাই সর্বস্ব হারিয়েছেন; সঙ্গে যে অস্ত্রগুলো ছিল তা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু নেই। কিন্তু তাঁরা রাজপুত, এই দারুণ অবস্থাতেও ভেঙে পড়লেন না। প্রথম শোকের ধাক্কা সামলে নিয়ে আবার

গড়তে শুরু করলেন।

এই যে বাড়িটা দেখছ এটাও তখনকার সময়ের বাড়ি; দুর্গ থেকে বেশ খানিকটা দূরে, তাই বেঁচে গিয়েছিল। বাড়িটা তখন নিম্নশ্রেণীর অতিথিদের জন্যে ব্যবহার হতো: নাচিয়ে-গাইয়েরা আসত, দূরের বণিকেরা সওদা নিয়ে এসে থাকত, মাঝে মাঝে এখানে নাচ গান মুজ্‌রোর মৌফিল বসত। ভূমিকম্পে বাড়িটা বিলক্ষণ জখম হয়েছিল কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়েনি।

যশবন্ত সিং এই বাড়ি মেরামত করিয়ে বাস করতে লাগলেন, দূর দূর থেকে লোক এনে গ্রাম বসালেন। নতুন লোকেরা মাটি কেটে নিজেদের ঘরবাড়ি তৈরি করল; ঘরবাড়ির সঙ্গে পুকুরও হল। গ্রামের নাম হল নন্দনপুর। এই সেই নন্দনপুর গ্রাম।

যশবন্ত সিং আর তাঁর সঙ্গীরা আবার বিয়ে করলেন, নতুন করে সংসার পাতলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের বংশধরের সংখ্যা বাড়তে লাগল। যথাকালে যশবন্ত সিং স্বর্গে গেলেন। তারপর পাঁচশো বছর কেটে গেছে। আমরা যশবন্ত সিং-এর বংশধরেরা এই গ্রামে এই বাড়িতে এখনো বাস করছি! কিন্তু নন্দনগড় রাজ্যের গৌরব-গরিমা আর ফিরে আসেনি।

যশবন্ত সিং ছিলেন নন্দনগড়ের রাজার ভাই। ভূমিকম্পের পর তিনি নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু নামেই রাজা। নন্দনগড় রাজ্যের সর্বনাশের খবর পেয়ে প্রতিবেশী রাজারা তাঁদের লাগোয়া জমি গ্রাস করেছিল। যশবন্ত সিং-এর টাকা নেই, সৈন্য নেই, কিসের জোরে রাজ্য রক্ষা করবেন। শেষ পর্যন্ত নন্দনপুর গ্রামের চারপাশের হাজার খানেক বিঘে জমি রয়ে গিয়েছিল। এই হাজার বিঘে জমিই এখন আমাদের সম্বল।

আর সম্বল আমাদের বংশমর্যাদা। বংশের সাবেক চালচলন আমি বজায় রেখেছি এবং যতদিন ক্ষমতা থাকবে রাখব।

রঘুবীর সিং চুপ করলেন। ইতিমধ্যে চাঁদ প্রায় মাথার ওপর উঠেছে, চারদিকের দৃশ্য যেন পাঁচশো বছর আগেকার স্বপ্ন দেখছে। একটা পাপিয়া দূরের আমবাগান থেকে বুকফাটা ডাক ডেকে উঠল—পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!

পঙ্কজ আস্তে আস্তে বলল—'দুর্গ ধসে গিয়ে যে গহ্বর হয়েছে, আপনি বললেন তা জলে ভরে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তো জল নেই—'

রঘুবীর বললেন—'না, এখন জল নেই। কিন্তু আমার মনে আছে পঁয়ত্রিশ বছর আগেও খাদের মধ্যে কাদা ছিল, বর্ষার সময় জল জমতো, বকেরা গিয়ে ব্যাঙাচি ধরে খেত। তারপর ক্রমে কাদাও শুকিয়ে গেল। ভেবে দেখ, পাঁচশো বছর লাগল জল শুকোতে। বোধহয় অন্তঃসলিলা নদীটা আস্তে আস্তে মজে গেল।'

পঙ্কজ বলল—'তাই হবে। এখন যদি খাদে নেমে মাটি খোঁড়া হয় তাহলে হয়তো নন্দনগড় দুর্গ খুঁড়ে বার করা যায়।'

রঘুবীর বললেন—'তা হয়তো যায়। কিন্তু ওই অতলস্পর্শ গর্তে নামবে কে? কারুর সাহস নেই। তাছাড়া দুর্গ খুঁড়ে বার করা তো দু-চার জন লোকের কাজ নয়। দুর্গের মধ্যে অনেক সোনাদানা হীরে জহরৎ চাপা পড়ে আছে, কিন্তু তা বার করতে হলে পাঁচশো জন লোক দরকার। অত লোক পাব কোথায়, তাদের মজুরীর টাকাই বা আসবে কোত্থেকে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন—'আমার আমলে হল না। শুনেছি সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আছে, তারা হয়তো কোনোদিন—'

পরদিন ভোরবেলা হনুমন্ত ঘুম ভেঙে দেখল পাশের খাটে পঙ্কজ নেই। তার বুঝতে বাকী রইল না পঙ্কজ কোথায় গিয়েছে। সে

তাড়াতাড়ি উঠে মুখে চোখে জল দিয়ে খাদের পানে ছুটল।

তেঁতুল গাছের তলায় পঙ্কজ বসে আছে, তার দৃষ্টি নীচে খাদের দিকে। হনুমন্ত তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু পঙ্কজ জানতে পারল না। হনুমন্ত তখন বলল—'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

পঙ্কজ তার দিকে ফিরল, যেন তার প্রশ্ন শুনতে পায়নি এমনি-ভাবে বলল—'হনু, একটা মতলব মাথায় এসেছে।'

হনু সন্দিগ্ধভাবে তাকাতে তাকাতে তার পাশে বসল—'কি মতলব?'

'আমি খাদে নামব, খুঁজে দেখব দুর্গের মধ্যে সেঁধোবার কোনো রাস্তা আছে কিনা।'

হনু ছানাবড়ার মতন চোখ করে বলল—'তুই একটা বদ্ধ পাগল। খাদে নামবি কি করে—লাফ মেরে? কোথাও নামবার রাস্তা নেই।'

পঙ্কজ বলল—'রাস্তা আছে। এই তেঁতুল গাছে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেবো, দড়ি ধরে নামব। আমি খুব সহজে দড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে পারি।'

'ওসব চলবে না। ওঠ বাড়ি যাই।'

দুই বন্ধুতে তর্ক বেধে গেল। হনুও যেতে দেবে না, পঙ্কজও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত হনু বলল—'তুই যদি নামিস, আমিও নামবো, তোকে একলা নামতে দেবো না।'

পঙ্কজ বলল—'তা কি করে হবে। তুই ওপরে থেকে দড়ি পাহারা দিবি। মনে কর আমরা দু'জনে নীচে নেমেছি। কেউ একজন এসে দড়ি খুলে নিয়ে চলে গেল। তখন কি হবে?'

হনু বলল—'হুঁঃ, বাবুজী যদি জানতে পারেন, দু'জনকেই ঘরে বন্ধ করে রাখবেন। চল্, ওঠ এখন।'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে হনু বলল—'অত লম্বা দড়িই বা কোথায়

পাওয়া যাবে? দশহাত বিশহাত দড়ি হলে তো চলবে না, পঞ্চাশ ষাট হাত দড়ি চাই।'

পঙ্কজ বলল—'তোদের গোয়ালঘরে তো অনেক গরু, গরু-বাঁধা দড়ি জোড়া দিয়ে দিয়ে লম্বা করা যাবে না?'

হনু উত্তর দিল না। তার মনেও সাড়া জেগেছে। অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনা স্নায়ুতে বইতে আরম্ভ করেছে। তবু সে দ্বিধাভরে বলল—'খাদের দিকে অবশ্য গাঁয়ের কেউ যায় না, কিন্তু যদিই কোনো-রকমে জানাজানি হয়ে যায়—'

'জানাজানি হতে দেবো না। চুপি চুপি কাজ করব।'

সমস্যার নিষ্পত্তি হল না, কিন্তু বোঝা গেল হনুও রাজী। এত বড় অ্যাডভেঞ্চারের লোভ কতক্ষণ সামলে থাকা যায়।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর পঙ্কজ তার বিছানায় লম্বা হয়েছে, হনুমন্ত এসে তার পাশে বসল, বলল—'বাবা কাল ভোরে পাটনা যাচ্ছেন।'

'তাই নাকি! তাহলে তো লাইন ক্লিয়ার!' পঙ্কজ উঠে বসল, কিন্তু হনুমন্তর মুখ দেখে থমকে গেল—'কেন রে হনু, পাটনা যাচ্ছেন কেন?'

হনু বিষণ্ণ গলায় বলল—'বিয়ের নেমন্তন্ন পত্র ছাপাবেন, গয়নাগাঁটি কাপড়চোপড় কিনবেন—'

পঙ্কজ চুপ করে রইল। হনু তখন মিনতি করে বলল—'তুই একবার চেষ্টা করে দ্যাখ না পাংখা, তোর কথা বাবা শুনতেও পারেন।'

'তুই নিজেই বল না কেন?'

'ও বাবা, অত সাহস আমার নেই। মাকে বলেছিলাম, তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন।'

'আচ্ছা আমি বলব।'

সেদিন সন্ধ্যের পর রঘুবীর সিং চাতালে বসে গড়গড়া টানছেন, পঙ্কজ তাঁর কাছে গিয়ে বসল। আজ রঘুবীর সিং-এর গায়ে সাধারণ সাজপোশাক, কানে কুণ্ডল গলায় হার নেই। তিনি হেসে বললেন—'কী, গল্প শুনবে নাকি? আরো অনেক গল্প আছে, মজার মজার গল্প।'

পঙ্কজ কাঁচুমাচু হয়ে বলল—'আজ্ঞে গল্প আর একদিন শুনব। যদি অনুমতি দেন হনুমন্তর বিয়ে সম্বন্ধে একটা কথা বলি।'

রঘুবীর সিং বললেন—'আমি কাল পাটনা যাচ্ছি বিয়ের বাজার করতে। কি বলবে বলো।'

'বিয়ে কবে স্থির করেছেন?'

'শ্রাবণ মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে। আজ থেকে দেড় মাস পরে।'

পঙ্কজ একটু চুপ করে থেকে বলল—'হনুমন্তর এখন বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই, ওর এখন পড়াশুনো করার ইচ্ছে।'

রঘুবীর বললেন—'পড়াশুনো করুক না, আমি কি ওকে কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি?'

'না, তবে ওর ইচ্ছে—'

'ছাখ বাবা, আমাদের বংশে আবহমানকাল নিয়ম চলে আসছে। ছেলের আঠারো বছর বয়স হলে তার বিয়ে হবে। হনুমন্তর এত ভয়টা কিসের?'

'এত ছোট মেয়ের সঙ্গে—'

'ছেলেমানুষী আর কাকে বলে। বউ তো আর বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর-ঘর করতে আসবে না। তিন-চার বছর বাপের বাড়িতে থাকবে। তারপর গৌনা হবে, তখন বউ শ্বশুরবাড়ি আসবে। এর মধ্যে হনুমন্ত যত ইচ্ছে পড়ুক, বি-এ, এম-এ পাস করুক, আমি কি মানা করেছি?'

এর পর আর তর্ক চলে না। পঙ্কজ ফিরে এসে হনুমন্তকে বলল। হনুমন্ত মুখ গোঁজ করে রইল, তারপর বলল—'আমি পালাব। বিবাগী হয়ে যাব।'

পরদিন সকালে রঘুবীর সিং দু'জন গোমস্তা সঙ্গে নিয়ে পাটনা চলে গেলেন। হনুমন্তর মন খারাপ, পঙ্কজ তাকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসল। হনুমন্ত বলল—'আমার কিছু ভাল লাগছে না। যা করবার তুই কর্, আমিও সঙ্গে আছি।'

পরামর্শ করে স্থির হল, প্রথমে দড়ি যোগাড় করতে হবে। সেটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়; গোয়ালঘরের লাগাও গুদামঘরে প্রচুর শণের দড়ি আছে। আসল সমস্যা দাঁড়াল, দু'জনেই যদি খাদে নামে তাহলে দড়ি আগলাবে কে? পঙ্কজ বলল—'ছেদিরামকে দলে টানলে কেমন হয়?'

হনুমন্ত বলল—'ও বাবা, ছেদিরাম গরুর গাড়ি চালায় বটে, কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রভুভক্ত, সটান গিয়ে মাকে বলে দেবে। সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

সমস্যা রয়েই গেল। যাহোক একটা কিছু করা যাবে, এই ভেবে তারা দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর দড়ি নিয়ে বেরুল। দুপুরের কড়া গরমে সবাই ঘরে ঢুকে ঘুমোচ্ছে, কেউ তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করল না।

আমবাগান দিয়ে যাবার সময় তারা মৌনীবাবার আস্তানার সামনে দিয়ে গেল, কিন্তু বাবাকে দেখতে পেল না। তখন তারা খাদের দিকে চলল।

মাঠ পার হয়ে তেঁতুলতলায় পৌঁছে তারা দেখল, মৌনীবাবা তেঁতুল গাছের ছায়ায় পদ্মাসনে বসে আছেন, তাদের দেখে মিটি মিটি হেসে বললেন—'বম্‌বম্—বম্‌বম্!'

দু'জনে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তবে কি বাবা তাদের প্ল্যান বুঝতে পেরেছেন? তারা তাঁর কাছে গিয়ে বসল, তাঁকে প্রণাম করে তাদের প্ল্যানের কথা বলল।

শুনে বাবা কিছু বললেন না, দড়িগুলো টেনে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। নতুন শণের আট-দশটা দড়ি, প্রত্যেকটা আট-দশ হাত লম্বা, কুয়োর দড়ির মতন মোটা আর মজবুত। বাবা প্রত্যেকটি দড়ির মাঝে দুটো করে গেরো বাঁধলেন, যাতে হাত পিছলে না যায়; তারপর দড়িগুলোকে জুড়ে জুড়ে লম্বা করলেন, আশি-নব্বই হাত লম্বা দড়ি ছিল। দড়ির একটা খুঁট তেঁতুল গাছের ডালে বেঁধে বাবা দড়ি খাদে ফেলে দিলেন। দড়ি ঝুলতে লাগল। বাবা তখন ভুরু তুলে দুই বন্ধুর পানে চাইলেন।

হনুমন্ত বলল—'আমি আগে নামব।'

পঙ্কজ বলল—'না, আমি আগে।'

হনুমন্ত কাতর ভাবে মৌনীবাবার পানে তাকাল—'বাবা, আপনি বলুন কে আগে নামবে। ওর যদি কোনো দুর্ঘটনা হয় আমি মুখ দেখাব কি করে?'

পঙ্কজ বলল—'আর তোর দুর্ঘটনা হতে পারে না! বুদ্ধিটা আমিই বের করেছিলাম, দুর্ঘটনা যদি হয় আমারই হওয়া উচিত।'

'বাবা, আপনি বলুন কে আগে নামবে।'

বাবা পঙ্কজের দিকে আঙুল দেখালেন।

পঙ্কজ মহানন্দে জুতো খুলে মালকোঁচা বেঁধে তৈরি হল; তার গায়ে শুধু কামিজ রইল। গিঁট বাঁধা দড়ি ধরে ওঠানামা করা খুব শক্ত নয়; হাত এবং পা দিয়ে দড়ি ধরা যায়। পঙ্কজ দড়ি ধরে সাবধানে খাদের মধ্যে নেমে গেল। হনুমন্ত তেঁতুল গাছের ডাল ধরে নীচের দিকে চেয়ে রইল। বাবা প্রসন্ন মুখে গাছতলায় বসে রইলেন।

ঝোপের শুকনো ডালপালা সরিয়ে দেখল, একটা মানুষ
মরে পড়ে আছে।

দড়িটা টান হয়ে ছিল, চার-পাঁচ মিনিট পরে আলগা হয়ে গেল। বোঝা গেল পঙ্কজ মাটিতে পা দিয়েছে।

মাটিতে নেমে পঙ্কজ দড়ি ছেড়ে দিল; এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো মাটির ওপর ঝোপঝাড় শুকিয়ে ডাঁটাসার হয়ে গেছে। ওই ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পায়ে হাঁটা রাস্তার মতন একটা দাগ দূরে উঁচু ঢিপির দিকে চলে গেছে। ওই ঢিপিটাই বোধহয় রাজবাড়ি ছিল।

একটা বিশ্রী গন্ধ পঙ্কজের নাকে আসছিল, তার উত্তেজিত মন এতক্ষণ তা লক্ষ্য করেনি। এখন পিছন দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল—শুকনো ঝোপঝাড়ের তলা থেকে একটা মানুষের পা বেরিয়ে আছে।

পঙ্কজ সেখান থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে একটা পাথরের ওপর বসল। দড়িটা নড়তে আরম্ভ করেছে, তার মানে হনুমন্ত নামছে। পঙ্কজ উঁচু দিকে চাইল, তারপর উঠে গিয়ে দড়িটা টেনে ধরল। কিছুক্ষণ পরে হনুমন্ত নেমে তার পাশে দাঁড়াল, একটু নেচে নিয়ে বলল—'কি মজা! পাঁচশো বছর পরে এখানে মানুষের পা পড়ল।' তারপর নাক সিঁটকে বলল—'কিসের পচা গন্ধ বেরুচ্চে রে পাংখা?'

পঙ্কজ আঙুল দেখিয়ে বলল—'ঐ যে। আমরা প্রথম নয়, আমাদের আগেও এখানে মানুষের পা পড়েছে।'

হনুমন্ত কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে রইল, তারপর ঝোপের কাছে গেল; পঙ্কজও নাকে কাপড় দিয়ে কাছে গেল। দু'জনে ঝোপের শুকনো ডালপালা সরিয়ে দেখল, একটা মানুষ মরে পড়ে আছে। তার গা এবং মুখের ওপর একরাশ দড়ি কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়েছে, মানুষটার মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শরীরের যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, তার হাড়গোড় ভেঙে চুর হয়ে গেছে।

তালপাকানো দড়িগুলো সরিয়ে নেবার পর মৃত লোকটার মুখ

দেখা গেল; হনুমন্ত তীক্ষ্ণ নিশ্বাস টেনে বলে উঠল—'ফেকুরাম নাপিত।'

কিছুক্ষণ মৃত্যু-শিথিল মুখের পানে চেয়ে থেকে হনুমন্ত শঙ্কাভরা চোখ পঙ্কজের পানে তুলল; পঙ্কজও একদৃষ্টে বীভৎস মড়ার পানে চেয়ে ছিল, বলল—'ওর কোমরের কাছে কি চকচক করছে!'

মৃতের পরনে ধুতি ছাড়া আর কোনো কাপড় ছিল না; কোমরে গিঁট বাঁধা। হনুমন্ত চোখ বুজে সেই দিকে হাত বাড়িয়ে মুঠিতে কিছু তুলে নিল, তারপর হাত খুলে দেখল—এক মুঠি মোহর।

দু'জনে অবাক হয়ে চেয়ে রইল, তারপর দূরে সরে গিয়ে পাথরের ওপর পাশাপাশি বসল। বেশ খানিকক্ষণ বসে রইল।

ব্যাপারটা যে কী হয়েছিল তা এখন অনুমান করা যায়।—ফেকুরাম নাপিত ছিল ধূর্ত ধড়িবাজ লোক। সে বুঝেছিল মাটিচাপা রাজবাড়িতে অনেক সোনাদানা আছে। একদিন সে চুপিচুপি তেঁতুল গাছে দড়ি বেঁধে নীচে নামল, রাজবাড়ি খুঁড়ে সোনাদানার সন্ধান পেল। তখন সে এক ফন্দি করল: সোনাদানা যা পায় তাই নিয়ে পাটনায় যায়, সেখানে মাল বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসে। গাঁয়ের লোক ভাবে, ফেকু পাটনা থেকে রোজগার করে আনে। এইভাবে অনেক দিন চলল, ফেকুর চালাকি কেউ ধরতে পারল না। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। দু-তিন দিন আগে ফেকু আবার খাদে নেমেছিল, কিন্তু দড়িটা সাবধানে গাছের ডালে বাঁধেনি। নামবার সময় দড়ি আলগা হলেও খুলে যায়নি, কিন্তু ফেকু যখন কোমরে মোহর গুঁজে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল তখন দড়ি খুলে গেল। ফেকু অনেক দূর উঠেছিল কিন্তু তেঁতুল গাছ বরাবর পৌঁছুবার আগেই দড়ি খুলে গেল; ফেকু পঞ্চাশ-ষাট হাত নীচে পড়ল, তার দেহ একেবারে থেঁতো হয়ে গেল। লোকে জানে ফেকু পাটনায় গিয়েছে; কেবল মৌনীবাবা বোধহয় আসল কথা জানতেন।

হনুমন্ত চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল, পঙ্কজের কথায় চমক ভাঙল—'দুপুর গড়িয়ে গেছে। যা ভাববার পরে ভাবা যাবে। এখন চল্, দেখি রাজবাড়িতে কোথায় কি আছে।'

হনুমন্ত উঠে দাঁড়াল, মোহরগুলো মেলে ধরে বলল—'এগুলো কী হবে?'

পঙ্কজ বলল—'কি আর হবে। তোদের জিনিস, পূর্বপুরুষের সোনা; ফেকু চুরি করছিল। এখন তোরা নিবি।'

হনুমন্ত একটু দ্বিধাভরে মোহরগুলো রুমালে বেঁধে পকেটে রাখল, বলল—'চল্।'

সামনে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট পায়ে-হাঁটা পথের রেখা, ওরা সেই রেখা ধরে চলল। রেখাটা এঁকেবেঁকে ঢিপি-ঢাপা এড়িয়ে বড় ঢিপির দিকে গিয়েছে। ফেকুর যাতায়াতের ফলে বোধহয় এই পথ তৈরি হয়েছে।

বড় ঢিপিটা দূর থেকে দেখেও বেশ বোঝা যায়, একটা প্রাসাদ বহু কাল জলের তলায় থাকার পর কাদা আর পাঁকের নীচে চাপা পড়েছে; জল শুকিয়ে যাবার পর প্রাসাদের আদল ও গড়ন জমাট-বাঁধা কাদার ভেতর দিয়েও বেশ আন্দাজ করা যায়। একতলাটা মাটির নীচে বসে গেছে। দোতলা এবং চিলে কোঠা উঁচু হয়ে আছে। তার সারা গায়ে কাঁটাগাছের জঙ্গল।

ঢিপির কাছে পৌঁছে তারা দেখল ফেকুরামের পায়ে-হাঁটা পথ শেষ হয়নি, ঢিপির গা ঘেঁষে পাশের দিকে গিয়েছে। তারা মোড় ঘুরল।

মোড় ঘুরে কয়েক পা গিয়েই তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঢিপির গায়ে একটা সুড়ঙ্গের মুখ, তার পাশে একটা গাঁইতি আর একটা খন্তা দাঁড় করানো রয়েছে।

তারা সুড়ঙ্গের কাছে গেল। শুধু গাঁইতি আর খন্তা নয়, সুড়ঙ্গের

মুখের মধ্যে রাখা রয়েছে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন।

সুড়ঙ্গের ভেতর দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সুড়ঙ্গ কোথায় কত দূরে গিয়েছে বোঝা যায় না, তবে একটা মানুষ নীচু হয়ে তার মধ্যে ঢুকতে পারে।

দুই বন্ধু একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বলা-কওয়ার কিছু ছিল না, ফেকু নাপিত তোড়জোড় করে এই সুড়ঙ্গ কেটে ভেতরে ঢুকেছিল এবং মোহরের সন্ধান পেয়েছিল তা অতিবড় মূর্খও বুঝতে পারে।

পঙ্কজ হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা বাইরে আনল। দেখা গেল তার খোলের মধ্যে তেল আছে; শুধু তাই নয়, লণ্ঠনের মাথার ওপর একটা দেশলাই-এর বাক্স। ফেকুরাম খুব গোছালো লোক ছিল, সবরকম ব্যবস্থা করে রেখে গেছে।

লণ্ঠন জ্বেলে পঙ্কজ বলল—'চল্ এবার চল্লিশ চোরের গুহায় প্রবেশ করা যাক। ফেকুরাম অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছে ফেকুরাম না থাকলে আমরা কি করতাম!'

লণ্ঠনের হাতল দাঁতে কামড়ে ধরে পঙ্কজ হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকল; হনুমন্ত তার পেছনে রইল। যদিও মাথার ওপর বেশ খানিকটা জায়গা আছে, তবু হামা দিয়ে অগ্রসর হওয়াই সুবিধে।

লণ্ঠনের আলোয় মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। দশ বারো হাত এগিয়ে যাবার পর পঙ্কজ বলল—'হনু, তোর রাজবাড়ির পাকা মেঝে এসে গেছে রে!'

'তাই নাকি!'

দু'জনে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, মাটির সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে, দু'পাশে পাথরের দেয়াল, ছাদও উঁচু। পঙ্কজ লণ্ঠন তুলে ধরে দেখতে লাগল: একটা লম্বা বারান্দার মতন জায়গা, প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে ভূমিকম্পের ঝাঁকানিতে ভেঙে পড়েনি, তার মধ্যে বেশী

কাদামাটিও জমেনি। বারান্দার বাঁ দিকের দেয়ালে আগে বোধহয় দোরের কপাট ছিল, এখন কপাট অদৃশ্য হয়েছে, কেবল দোরের ফোকর দেখা যাচ্ছে। এই ফোকরের মধ্যে আবার সুড়ঙ্গ। কিন্তু বেশী লম্বা নয়, দু-চার হাত গিয়ে আবার একটা ঘরের মতন জায়গা।

সেখানে ঢুকে ওরা লণ্ঠন ধরে ধরে চারদিক দেখল। ঘরটাতে কিছু মাটি জমেছিল, কেউ সম্প্রতি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পরিষ্কার করেছে। ফেকুরাম ছাড়া আর কে হতে পারে? হয়তো এই ঘরে কাঠের সিন্দুকে দামী জিনিস ছিল; কাঠের সিন্দুক ও নশ্বর সবকিছু বহুকাল নষ্ট হয়ে গেছে, কেবল সোনা হীরা মোতি নষ্ট হয়নি। ফেকু সেইসব জিনিস সংগ্রহ করতে আসত। এখন ঘরে সোনাদানা আর কিছু নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তারা বারান্দা দিয়ে সামনের দিকে চলল। আরো কিছুদূর গিয়ে বারান্দা শেষ হয়েছে, সামনে দেয়াল। ওরা আলো ধরে দেখল, দেয়ালটা পাথরের কিন্তু তার মাঝখানে দোরের মতন চৌকস জায়গায় কাদা আর পাঁক জমাট হয়ে সিমেন্টের মতন শক্ত হয়ে গেছে। ওরা টোকা মেরে দেখল, দেয়ালের মতন পুরু নয়। ওপারে হয়তো আর একটা ঘর আছে।

হনুমন্ত বলল—'ছাখ, দেয়ালের গায়ে গাঁইতির দাগ; ফেকু বোধহয় ভাঙবার চেষ্টা করেছিল।'

পঙ্কজ বলল—'হুঁ। ও ঘরের সব সোনাদানা শেষ করে এইঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আজ আর নয়, ফিরে চল্। সময়ের কোনো আন্দাজ নেই, হয়তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

হনুমন্ত বলল—'হ্যাঁ, মৌনীবাবা তেঁতুলতলায় বসে দড়ি পাহারা দিচ্ছেন। আজ চল, কাল আবার আসা যাবে, কি বলিস্?'

'সে আর বলতে!'

দু'জনে বাইরে ফিরে এল। লণ্ঠন নিবিয়ে রেখে বাইরের মুক্ত

হাওয়ায় কিছুক্ষণ নিশ্বাস নিল। সন্ধ্যে হয়নি বটে, কিন্তু নীচে রোদ নেই, দূরে ওই তেঁতুলগাছের পাতায় নিবন্ত সূর্যের সোনালী আলো ঝিলমিল করছে।

যেতে যেতে হনুমন্ত বলল—'ফেকুরামের মড়াটা নিয়ে কী করা যায়! ওপরে তোলা আমাদের কর্ম নয়। তাছাড়া তুললেই গাঁয়ে জানাজানি হবে, আমাদের গুপ্তকথাও ফাঁস হয়ে যাবে।'

পঙ্কজ বলল—'হুঁ। কিন্তু মৌনীবাবাকে জানাতে হবে। তিনি অন্য কাউকে কিছু বলবেন না কিন্তু আমাদের পরামর্শ দিতে পারেন।'

দড়ি যেমন ঝুলেছিল তেমনি ঝুলছে। প্রথমে পঙ্কজ ওপরে উঠে গেল; সে পৌঁছুবার পর হনুমন্ত উঠল। মৌনীবাবা দড়ি আগলে বসেছিলেন, বললেন—'বম্‌বম্!'

ওরা তখন মৌনীবাবার সামনে বসে সব কথা বলল, বাবা মন দিয়ে শুনলেন। শেষে হনুমন্ত বলল—'বাবা, কাল আবার আমরা নামব। একটু সকাল সকাল আসব। কিন্তু ফেকুর মড়াটা নিয়ে কী হবে?'

বাবা হাত তুলে আশ্বাস দিলেন, যেন বললেন—ভাবিসনে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

গাছের ডাল থেকে দড়ি খুলে নিয়ে তারা মৌনীবাবার সঙ্গে আমবাগানে গেল, সেখানে চালাঘরে দড়ি লুকিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে গেল। তাদের অভিযানের খবর কেউ জানল না।

সন্ধ্যের পর ঘরে দোর বন্ধ করে তারা পরামর্শ করতে বসল। হনুমন্ত বলল—'একটা বড় ভুল হয়ে গেছে; মোহরগুলো মৌনীবাবার কাছে রেখে এলেই হতো, বাড়িতে রাখার জায়গা নেই, বাইরে রাখলে চাকরদের নজরে পড়বে। মাকে দিলে মা জানতে চাইবেন কোথা থেকে মোহর এল।—কি করি বল তো?'

পঙ্কজ ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হনুমন্ত নিজেই বলল—

'এক কাজ করা যাক, ওগুলো তোর সুটকেসে রেখে দে। তোর সুটকেস কেউ খুলবে না।'

পঙ্কজ বলল—'আচ্ছা।'

মোহরগুলো পঙ্কজের সুটকেসে রেখে চাবি লাগিয়ে তারা আবার মুখোমুখি বসল। পঙ্কজ বলল—'কাল সকাল সকাল বেরুতে হবে। মা কিছু সন্দেহ করবেন না তো?'

হনুমন্ত একটু ভেবে বলল—'মাকে যদি বলা যায় আমরা জঙ্গলে পাখি-শিকার করতে যাচ্ছি তাহলে মা কিছু সন্দেহ করবেন না। একটা অসুবিধে, বন্দুকটাও নিয়ে যেতে হবে; বন্দুক কার্ট্রিজ সব সঙ্গে নিতে হবে। উপায় কি। ওগুলো মৌনীবাবার ঝোপড়িতে রেখে গেলেই হবে।'

পঙ্কজ বলল—'একটা জোরালো আলো যদি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো! লণ্ঠনের আলোয় ভালো দেখা যায় না।'

হনুমন্ত বলল—'দাঁড়া, ঠিক হয়েছে। বাবুজীর একটা ইয়াব্বড় টর্চ আছে, দিনের মতন আলো হয়। সেটা চুরি করব।'

রাত্রে খাবার সময় হনুমন্ত মাকে শিকারে যাবার কথা বলে রাখল। মা বললেন—'এই জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরে পাখি কোথায় পাবি!'

হনুমন্ত বলল—'না পাই, বন্দুক ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াব।'

'তা বেড়াস। সন্ধ্যের আগে ফিরে আসবি কিন্তু।'

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ দুই বন্ধু খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে বেরুল। হনুমন্তর কাঁধে দোনলা বন্দুক, পঙ্কজের হাতে টর্চ আর কার্তুজের থলি।

আমবাগানে গিয়ে তারা দেখল, মৌনীবাবা ধুনির সামনে বসে আছেন। হনুমন্ত বলল—'বাবা, এই বন্দুকটা ঝোপড়িতে রেখে দড়িটা নিয়ে যাব।'

বাবা মাথা নাড়লেন, হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা নিজের হাতে নিয়ে

উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হনুমন্ত যখন দড়ির কুণ্ডলী একচালা থেকে বার করে আনল তখন তিনি বন্দুক কাঁধে ফেলে কার্তুজের থলি হাতে তেঁতুল গাছের দিকে পা বাড়ালেন।

দু'জনে মুখ তাকাতাকি করল। হয়তো বাবা নিজের শূন্য আস্তানায় বন্দুক ফেলে রেখে যেতে চান না; ঘর থেকে যদি কেউ তুলে নিয়ে যায়—

তেঁতুলতলায় পৌঁছে বাবা প্রথমে দড়ির একটা খুঁট তেঁতুল গাছের ডালে বেঁধে ফেললেন, অন্য খুঁটে বন্দুক আর কার্তুজের থলি বেঁধে নীচে নামিয়ে দিলেন। তারপর হনুমন্তকে ইশারা করলেন। আজ হনুমন্ত আগে নামল, পরে পঙ্কজ। তারা আন্দাজ করল, বাবার ইচ্ছে বন্দুকটা তাদের সঙ্গে থাকে।

নীচে নেমে তারা একটা নতুন দৃশ্য দেখল। যেখানে ফেকুরামের মৃতদেহ পড়েছিল সেখানে দশ-বারোটা শকুনি এসে জুটেছে। শকুনিরা খুবই ব্যস্ত। দুই বন্ধু সেদিকে তাকালো না। তাড়াতাড়ি দড়ি থেকে বন্দুক আর থলি খুলে নিয়ে রাজবাড়ির ঢিপির দিকে চলল। যেতে যেতে হনুমন্ত বলল—'বাবা নিশ্চয় জানতেন শকুনি আসবে।'

পঙ্কজ বলল—'হু। শকুনিরা হল প্রকৃতির সেরা মুদ্দাফরাশ। আমরা যখন মড়া নাড়াচাড়া করছিলাম তখন বোধহয় ওরা দেখতে পেয়েছিল।'

'কিন্তু বাবা আজ আমাদের সঙ্গে বন্দুক দিলেন কেন ভাই? এখানে কি হিংস্র জন্তু জানোয়ার আছে নাকি?'

'কই, কাল তো কিছু চোখে পড়েনি। যাহোক, বন্দুক সঙ্গে আছে ভালই। বাঘভালুক না থাক, সাপখোপ থাকতে পারে।'

সুড়ঙ্গের সামনে পৌঁছে পঙ্কজ বলল—'আজকের প্রোগ্রাম কি?'

হনুমন্ত বলল—'ফেকুরাম যে দেয়ালটা ভাঙবার চেষ্টা করেছিল

সেটা আগে ভাঙতে হবে। ওখানে নিশ্চয় অনেক দামী মাল আছে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে গাঁইতি আর শাবল চালালে ভাঙতে পারব না?'

পঙ্কজ বলল—'চেষ্টা করতে দোষ কি! কিন্তু কি রকম দামী মাল তুই আশা করিস?'

হনুমন্ত এদিক ওদিক চেয়ে বলল—'তা কি বলা যায়। হয়তো কিছুই নেই। তবু—'

দু'জনে উঠল, বন্দুক আর কার্তুজের থলি বাইরে রেখে লণ্ঠন জেলে সুড়ঙ্গে ঢুকল। তাদের সঙ্গে রইল টর্চ গাঁইতি আর শাবল।

সুড়ঙ্গের শেষ বরাবর পৌঁছে হনুমন্ত টর্চ জ্বালল; তীব্র আলোয় সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ ভরে গেল। লণ্ঠনের আলো তার কাছে টিমটিম করতে লাগল।

লণ্ঠন আর টর্চ নামিয়ে রেখে ওরা শাবল আর গাঁইতি হাতে নিল; পঙ্কজ দেয়ালের সামনে গিয়ে দু'হাতে শাবল তুলল, বলল—'এক সঙ্গে এক জায়গায় লাগাবি। রেডি? ওয়ান টু থ্রি!'

শাবল আর গাঁইতি একসঙ্গে দেয়ালের গায়ে পড়ল। ঠং করে শব্দ হল। শব্দ শুনে বোঝা যায় ইট-পাথরের দেয়াল নয়; কিন্তু উপাদান যা-ই হোক, এক চুল নড়ল না।

আরো আট-দশ বার শাবল গাঁইতি চালিয়েও কোনো ফল হল না, দেয়াল অটুট দাঁড়িয়ে রইল। পঙ্কজ আর হনুমন্ত দু'জনেরই গা ঘামে ভিজে গেছে, দু'জনেই হাঁপাচ্ছে। হনুমন্ত বলল—'চল্ বাইরে যাই, এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

সুড়ঙ্গের মধ্যে বায়ু চলাচল কম, ওরা ফিরে এসে সুড়ঙ্গের মুখের কাছে বসে খানিক জিরিয়ে নিল। বাইরে রোদ্দুর আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বাতাসও আছে।

গায়ের ঘাম শুকোতে না শুকোতে পঙ্কজের মাথায় বুদ্ধি খেলে

গেল—'হনু !'

'কি রে !'

'এক কাজ করলে হয় না ? দোনলা বন্দুকে দুটো টোটা পুরে যদি একসঙ্গে ফায়ার করা যায়—'

হনুমন্ত চোখ গোল করে খানিক চেয়ে রইল, তারপর পঙ্কজের গলা জড়িয়ে ধরে বলল—'পাংখা ! শাবাস তোর বুদ্ধি। এ কথা তো এতক্ষণ মাথায় আসেনি !' একটু থেমে বলল—'ছাখ, মৌনীবাবা নিশ্চয় অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ পুরুষ, তাই বন্দুকটা আমাদের সঙ্গে দিয়েছেন। —তুই আগে কখনো বন্দুক ছুঁড়েছিস ?'

'অনেকবার ছুঁড়েছি। হাঁস মেরেছি, খরগোশ মেরেছি। আমার বাবারও বন্দুক আছে।'

'তবে, তুইই ফায়ার কর।'

'কেন, তুইও তো অনেক বন্দুক চালিয়েছিস।'

'তা চালিয়েছি। কিন্তু বুদ্ধিটা তোর ! নে, বন্দুকে টোটা ভর্।'

'এখন ভরব না, ভেতরে গিয়ে ভরব।' থলি থেকে পঙ্কজ কার্তুজগুলো বার করল। দশটা কার্তুজের মধ্যে গোটা ছয়েক এস্ এস্ জি ছিল, পঙ্কজ সেগুলো পকেটে পুরে বলল—'চল্। তুই টর্চ নিয়ে আগে যা।'

সুড়ঙ্গে ঢুকে প্রথমে হামাগুড়ি দিয়ে তারপর খাড়া হেঁটে তারা দেয়ালের সামনে উপস্থিত হল। দু'জনেরই মনে হল তারা একটা বিরাট রহস্যের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের বুক দুরুদুরু করে উঠল।

পঙ্কজ চাপা গলায় বলল—'কত দূর থেকে ফায়ার করব ?'

হনুমন্ত বলল—'অন্ততঃ দশ বারো হাত দূর থেকে, নইলে ছর্‌রা ছিটকে গায়ে লাগতে পারে। পাংখা, তুই বরং বন্দুক আমাকে দে, আমি এ বন্দুক অনেকবার ছুঁড়েছি, এর ধাত জানি।'

'না, আমি ফায়ার করব। কিন্তু বদ্ধ জায়গায় ভীষণ শব্দ হবে। হনু, তুই কানে আঙুল দিয়ে থাকিস, নইলে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে।'

'আর তুই?'

'আমি কানের ওপর শক্ত করে রুমাল বাঁধব। এই ছাখ্।'

রুমালকে কোনাকুনি ভাবে দু'পাট করে পঙ্কজ মাথা ঘিরে কপালের ওপর বেঁধে ফেলল, কান চাপা পড়ল। তারপর বন্দুকের দুই নলে টোটা পুরে দেয়াল থেকে দশ পা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। হনুমন্ত তার পাশে দাঁড়িয়ে দুই কানে আঙুল পুরে দিল। টর্চ জ্বালা হল না, কেবল লণ্ঠনের আলো।

'এইবার!' বলে পঙ্কজ বন্দুকের ঘোড়া টিপল।

বিকট শব্দ হল। সংকীর্ণ জায়গায় ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনি মিলে যেন দৈত্য দানবের মত লড়াই করতে লাগল। ওপর থেকে খানিকটা মাটি খসে মেঝেয় পড়ল। লণ্ঠনের কাঁচ চিড় খেয়ে গেল।

পঙ্কজ আর হনুমন্ত ছুটে দেয়ালের কাছে গেল। দেয়াল ভেঙে পড়েনি, কিন্তু তার চার পাশ থেকে একটা শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। দু'জনে অবুঝের মতন মুখ তাকাতাকি করল, তারপর পঙ্কজ লাফিয়ে উঠে বলল—'বুঝেছি, দেয়ালের ওদিকে হাওয়া নেই, এদিক থেকে হাওয়া ঢুকছে, তারই শব্দ। তার মানে দেয়াল আলগা হয়েছে, আবার বন্দুক ছুঁড়লেই—'

হনুমন্ত বলল—'এবার আমি বন্দুক ছুঁড়ব।'

'আচ্ছা।'

পঙ্কজ বন্দুকের দুই নলে আবার টোটা ভরে হনুমন্তর হাতে দিল, নিজের মাথা থেকে রুমাল খুলে তার মাথায় বেঁধে দিল, তারপর কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়াল।

হনুমন্ত দেয়াল লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপল—গুড়ুম।

বিচিত্র কারুকার্যের একটা পালঙ্ক। আর সেই পালঙ্কের উপর শুয়ে আছে দুটি মানুষ।

প্রতিধ্বনির শব্দ থেমে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা শব্দ হল—ধপাস। লণ্ঠনটা দু'বার খাবি খেয়ে নিভে গেল।

টর্চটা পঙ্কজ কনুই-এর খাঁজে চেপে রেখেছিল, এখন সেটা জ্বেলে সে দেয়ালের দিকে আলো ফেলল; দেখল দেয়াল নেই, ছররার ধাক্কা খেয়ে ঘরের মধ্যে ভেঙে পড়েছে। দু'জনে একসঙ্গে সেইদিকে ছুটল।

টর্চের আলোয় একটি ঘরের অভ্যন্তর উদ্ভাসিত হল। বেশ বড় একটি শয়নকক্ষ। দরজা জানালা আগে ছিল, এখন দেয়ালে পরিণত হয়েছে। ঘরে অনেক রকম সেকেলে আসবাব সাজানো রয়েছে, উঁচু পিঁড়ি, স্ফটিকের ভৃঙ্গার, দীপদণ্ড, আরো কত কি; এগুলো অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে। টর্চের তীব্র ছটা গিয়ে পড়েছিল ঘরের মাঝখানে। একটি পালঙ্কে শয্যা পাতা রয়েছে, বিচিত্র কারুকার্যের একটি পালঙ্ক, আর সেই পালঙ্কের ওপর শুয়ে আছে দু'টি মানুষ।

হনুমন্ত আর পঙ্কজ অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে পালঙ্কের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। যে-দু'টি মানুষ পালঙ্কে শুয়ে আছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আঠারো-উনিশ বছর বয়সের একটি কিশোর যুবা, আর তার পাশে শুয়ে আছে বারো-তেরো বছরের একটি কিশোরী মেয়ে। বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা, অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। দু'জনেই মৃত। কিন্তু তাদের দেখে তা মনে হয় না। মনে হয় যেন ঘুমিয়ে আছে; ঘরে লোক ঢুকেছে সাড়া পেয়ে এখনি জেগে উঠবে।

হনুমন্ত গলার মধ্যে একটা শব্দ করে পঙ্কজের কাঁধ চেপে ধরল —'পাংখা! চিনতে পারছিস্?'

পঙ্কজের গলা প্রায় বুজে গিয়েছিল, সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করল —'পারছি। তুই আর তোর ভাবী বউ রামদুলারী—'

কিছুক্ষণ কোনো কথা নেই, তারপর হনুমন্ত স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় বলল—'ওর নাম ছিল মৈথিলী। চেহারা পাঁচশো বছর আগে যা

ছিল এ জন্মেও তাই আছে।···সে রাত্রে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ গভীর রাত্রে এল ভূমিকম্প আর জলোচ্ছ্বাস—ঘরের দরজা জানালা দিয়ে হাওয়া-বাতাসের চলাচল বন্ধ হয়ে গেল—তারপর কী যে হল—'

পঙ্কজ বলল—'ঘর থেকে বেরুবার উপায় নেই দেখে তোরা আবার বিছানায় গিয়ে শুলি···ঘরের হাওয়া ফুরিয়ে আসতে লাগল, দীপদণ্ডে দীপ নিবে গেল, তোরা অজ্ঞান হয়ে পড়লি···তারপর তোদের মূর্ছা মহানিদ্রায় পরিণত হল—'

হনুমন্ত হঠাৎ ভয়ার্ত স্বরে বলল—'আমি—আমার সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—আমি আর মৈথিলী—আমি আর মৈথিলী—' সে আর বলতে পারল না, তার গলা কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেল।

দু'জনে হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। এইভাবে কতক্ষণ যে কেটে গেল তার ঠিকানা নেই। কেবল টর্চের উগ্র আলো পালঙ্কের দু'টি মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল।

হঠাৎ পঙ্কজ চিৎকার করে উঠল—'একি! একি! এ কি হচ্ছে!'

তাদের চোখের সামনে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছিল। পালঙ্কে শোয়া মূর্তি দু'টি কর্পূরের পুতুলের মতন উপে যেতে লাগল। পঙ্কজ আর হনুমন্তর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে আস্তে আস্তে তাদের মুখ হাত পা সব শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, হাওয়ায় মিশিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পালঙ্কে পড়ে রইল ধুলোগুঁড়োর মতন খানিকটা পদার্থ। পাঁচশো বছর বন্ধ ঘরের মধ্যে যা অটুট ছিল, আলো-বাতাসের স্পর্শে দেখতে দেখতে তা অণু-পরমাণুতে পরিণত হল।

রাত্রে পঙ্কজ আর হনুমন্ত নিজের নিজের খাটে শুয়ে চিন্তা

[illegible] দুজনেরই মাথা উত্তপ্ত হয়েছে, ঘুম আসছে না, [illegible] বলবার মত মনের অবস্থা নয়।

মোহাচ্ছন্ন মন নিয়ে তারা নন্দনগড়ের সুড়ঙ্গ থেকে এসেছিল। কেউ কোনো কথা বলল না, নির্দিষ্ট পথে ফিরে চলল। দড়ির কাছে এসে পঙ্কজ আবছায়া ভাবে অনুভব করল, ফেকুরামের মড়াটা নেই, শকুনিগুলোও অদৃশ্য হয়েছে।

ওপরে এসে মৌনীবাবার মুখে স্নিগ্ধ মধুর হাসি দেখে তারা বুঝতে পেরেছিল, বাবা সবই জানেন বলেই তাদের নন্দনগড় দুর্গের রহস্য সন্ধানে যেতে দিয়েছিলেন। কিন্তু কি করে জানলেন? হয়তো তাঁর দৈবশক্তি আছে। সাধুরা সকলেই ভণ্ড নয়, দু'চারজন খাঁটী সাধু থাকতে পারে—

দুপুর রাত্রে হনুমন্ত উঠে এসে পঙ্কজের খাটের পাশে বসল, বলল—'পাংখা জেগে আছিস?'

পঙ্কজ বলল—'হুঁ। কি খবর?'

হনুমন্ত বলল—'আমি ঠিক করেছি, রামদুলারীকে বিয়ে করব।'

পঙ্কজ মুখ টিপে হাসল—'তাহলে বিবাগী হবি না?'

হনুমন্তও হাসল—'উঁহু, এখন নয়। পাঁচশো বছরের পুরনো বউকে বিয়ে না করলে অন্যায় হবে।'

পঙ্কজ উঠে বসল—'আচ্ছা হনু, আগের জন্মের সব কথা তোর মনে পড়েছে?'

'সব কথা নয়, অনেক কথা মনে পড়েছে। চেষ্টা করলে বোধ হয় সব কথা মনে পড়বে।'

'তোর বউ-এর নাম ছিল মৈথিলী। তোর কি নাম ছিল?'

'আমার নাম ছিল রঘুনন্দন সিং।'

'হুঁ। আগের জন্মে তোদের নামের বেশ জোড় মিলেছিল, এজন্মে গরমিল হল কেন?'

'গরমিল কোথায় ?'

তুই হলি হনুমন্ত, মানে হনুমান, তোর বউ রামদুলারী [redacted] সীতা। গরমিল হল না ?'

'তুই কিচ্ছু জানিস না। আমার পুরো নাম হনুমন্তরাজ সিং; মানে হনুমান নয়, হনুমানের মালিক। হনুমানের মালিক কে? রামচন্দ্র। বুঝলি ?'

'বুঝলাম। এবার তুই আগের জন্মের গল্প বল্, যা মনে আছে সব বলবি, কিচ্ছু বাদ দিবি না।'

'আচ্ছা, শোন তবে—'

হনুমন্ত গল্প বলতে আরম্ভ করল—

কিন্তু সে-গল্প অন্য গল্প।